অসাধারণ এক তাবলিগী সফরনামা

প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

অসাধারণ এক তাবলিগী সফরনামা

ইয়েমেনে একশত বিশদিন

দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ
এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

অসাধারণ এক তাবলিগী সফরনামা

ইয়েমেনে একশত বিশদিন

প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

প্রকাশক

রাহনুমা প্রকাশনী

মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯

মোবাইল ঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৭২৩-০১৬৬২৬

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আযহার

মধ্য বাড্ডা, মোল্লা পাড়া, আদর্শ নগর, ঢাকা।

ফোন ঃ ০২-৯৮৮১৫৩২, মোবাইল ঃ ০১৯২৪-০৭৬৩৬৫, ০১৭১৫-০২৩১১৮

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ–

জানুয়ারী- ২০১২

ISBN 978-984-33-3781-8

মুদ্রণ

আইফা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯

হাদিয়া

১৩০/- (একশত ত্রিশ টাকা মাত্র)

লেখকের কথা

তবলীগের সফর দীনের মেহনতের সফর। এখানে সময়কে যত বেশি দ্বীনের কাজে লাগানো যায় ততই মঙ্গল। তাহলে এই সফরকে নিয়ে কেন আমার এই রোজনামচা এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগবে। এ বিষয়ে পাঠকের খেদমতে অধমের বিনীত কৈফিয়ত পেশ করা জরুরী মনে করছি।

সফর করতে আমার ভাল লাগে। সফরে আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও মানুষের জীবন যাপন প্রণালীর বিভিন্নতা সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়। দেশ বা বিদেশের সফরে টুকিটাকি নানা বর্ণনা ছাড়াও পুরা সফরের কাহিনী বাড়ীতে এসে ছেলেমেয়েদের বলা আমার পুরনো অভ্যাস। নতুন অবস্থায় এসব ঘটনা কিছু মনে থাকে আর কিছু বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। কিন্তু ডাইরীতে আগোছালো হলেও লিখে রাখলে তা থেকে যায় অনেকদিন। তাই এবারের সফরেও অভ্যাস বশত একটা ডাইরী সঙ্গেই ছিল।

আরবী শিক্ষিত মানুষ আমি নই। আমার পক্ষে ইয়েমেনের আঞ্চলিক আরবীতে স্থানীয় সাথী ভাইদের সঙ্গে কথা বলা দোভাষী ছাড়া সম্ভব ছিল না। ফলে মাঝে মধ্যে অবসর সময় হাতে পেতাম এবং পূর্ব অভ্যাসের কারণে ডাইরী খুলে সময়কে ধরে রাখতাম। হঠাৎ একদিন আমার এক সফরসঙ্গী জানতে চাইলেন আমি এসব কি লিখি। এককথায় জবাব দিলাম কিন্তু "ভবি ভুলবার নয়"। বললেন, পড়ুন আমি শুনব। তিনি শুধু শুনলেনই না, সব সাথীকে ডেকে এনে শুনালেন এবং প্রত্যেক লেখার পরপরই তাদেরকে সেটা পড়ে শুনানো বাধ্যতামূলক করিয়ে ছাড়লেন। এ ভাবেই এই লেখা আমার 'একান্ত ব্যক্তিগত' পর্যায় অতিক্রম করে আমাদের সেই জামাতের 'সমষ্টিগত' বিষয়ের রূপ নিল। আমার সাথীরা আমাকে শেষদিন পর্যন্ত উৎসাহ দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে সামনে টেনে নিয়ে না গেলে আজকের এই বইটি আলোর মুখ দেখত কিনা সন্দেহ।

দেশে ফিরে রুটিন মাফিক ঘটনাগুলো ছেলেমেয়েদের শুনালাম। ওরা আমার কাছে লেখাটি ছাপানোর আবদার করতে থাকল। তাদের সাথে মাওলানা মাসউদ (বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় দুইটি বই 'তারবিয়াতুস সালিক ও তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন' এর অনুবাদক) আরো এক ডিগ্রী বাড়িয়ে লেখাটি কম্পিউটার কম্পোজ করিয়ে ঢাকায় নিয়ে গেলেন এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে 'আলকাউসার' এর মতো বিখ্যাত দ্বীনি পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় তা ছাপাও হল। এবার চেনা অচেনা অনেকেই বই আকারে লেখাটি প্রকাশ করতে অনুরোধ জানালেন। ফলশ্রুতিতে রাহনুমা প্রকাশনীর তরফ থেকে আমার জন্য এই আশাতীত সৌভাগ্য আল্লাহ নসীব করলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

ইয়েমেন বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরের দেশ। দেশ ও অঞ্চল ভেদে মানুষের জীবন যাপনে ও আচার আচরণে কত পার্থক্য, দ্বীনের প্রতি তাদের প্রচন্ড আগ্রহ আর আমাদের চরম উদাসিনতার এই ছবি স্পষ্টভাবে দেখতে পারলে তা আমাদের বোধ ও চেতনার দরজায় বলিষ্ঠভাবে ঘা দেবে বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া যারা মনে করেন 'চৌদ্দশ বছরের পুরাতন ইসলাম মানা মোটেই সহজ নয়' তারা একটু মন খুলে এদিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন তাদের ধারণা কত কাঁচা এবং একপেশে। মন-মানসিকতার রঙ্গীন চশমার ভেতর দিয়ে না তাকিয়ে সাদা চোখে পৃথিবীকে 'যা যেমন তা তেমন' ভাবে উপলব্ধি করার ভেতর দেখার প্রকৃত সার্থকতা।

আপনি, যিনি এই লেখা পড়ছেন, যদি এটা আপনার ভাল লাগে তাহলে আমার এই লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আর যদি ভাল না লাগে তাহলে সেটা আমারই ব্যর্থতা, সেজন্য অন্য কেউ নয় আমি নিজেই দায়ী। পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের সকলকে ঈমানী জিন্দেগী দান করেন। আমীন।

দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
পাবনা

আমার
সবচেয়ে গর্বের
সবচেয়ে আদরের
সবচেয়ে ভালবাসার জন
আমার
মা
ও
আব্বাকে

শুরুর কথা

বিরান মরু এলাকা, চারিদিকে ধু ধু প্রান্তর। ছোট ছোট ঢিবি এবং আগাছা আর মাঝে মধ্যে মস্তবড় ছাতার মতো এক ধরনের কাঁটা গাছ (এদেশের বাবলা স্থানীয় নাম সিডর)। একসঙ্গে মেলে রাখা হাজার হাজার সবুজ ছাতার মতো দেখতে। আরও একটু সামনে এগুলেই অসীম পাথার- নীল সমুদ্র। এর মাঝে নীল রং এর পর্দা ঘেরা বিরাট এলাকায় এজতেমার আয়োজন করা হয়েছে। বিকালের বয়ান দিয়ে এজতেমা শুরু হবে জন্য সকাল বেলায়ই আমরা হুদায়দা মার্কাজ থেকে এজতেমা মাঠে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম। মারকাজ থেকে এজতেমার মাঠের দূরত্ব পচিঁশ কিলোমিটার- মাথা পিছু ভাড়া এদেশের একশত ইয়েমেনি রিয়েল, আমাদের হিসাবে চৌত্রিশ/পঁয়ত্রিশ টাকার মতো। চৌদ্দ সিটের একটা লাইট এস মাইক্রো ভাড়া করলাম আমরা ছয় জন, সঙ্গে এলেন এক আরবী তরুণ- তিনি মক্কায় থাকেন এবং এছাড়াও দুই জন স্থানীয় বাসিন্দা। লোক কম তাতে কি? ভাড়া মাথা পিছু একই থাকল। আসলে এখানে রিক্সা বা স্কুটার নাই। অসংখ্য ট্যাক্সি চলাচল করছে। মিটার নাই কিন্তু ভাড়ার কোন জবরদস্তিও নাই। ড্রাইভাররা খুবই আন্তরিক– অনেকটা পড়শীর গাড়ীতে লিফট নেওয়ার মতো। যেহেতু এজতেমা দুই দিন চলবে। তাই এজতেমার আগের কাহিনীটাই আগে বলা দরকার।

এটা এখনও ভাবতে আমার অবাক লাগছে যে, যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, যার আমি বিরোধী ছিলাম বিদেশ সফরে সেই আমিই যে হঠাৎ করে রাজী হয়ে যাব এবং তাও আবার এমন একটি দেশে যার ভাষা পর্যন্ত আমার জানা নাই। অথচ এটাও একদম সত্য যে এখন আমি ইয়েমেনের রাজধানী সানা হয়ে হুদায়দার এজতেমা মাঠে বসে ডাইরী লেখা শুরু করলাম। আসলে মানুষ যে কিছুই করতে পারে না সবকিছুই করান আল্লাহ সেটা তো অবিশ্বাস করার কোনই বৈধ যুক্তি নাই।

তাসকিল বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু নয়। মওলানা মিজান ও হাজী শফিউল ইসলাম রঞ্জুসহ মাস্তুরাতে বিদেশী মেহমানের বয়ান শেষে আসর নামায পড়লাম। বিদেশী জামাতের সাথীরা অন্য মসজিদে কিভাবে যাবেন সেই ফিকির চলছিল। আমি বাড়ীতে চলে আসব এমন সময় উনাদের একটা কথা কানে আসল। “বিদেশ সফর বোধ হয় আর হচ্ছেনা”। আগ্রহ হল– জানতে চাইলাম বিষয়টি। বললেন গত ডিসেম্বর’ দুই হাজার সাত এ তারা সোয়াদ (অনুমতি প্রাপ্ত) হয়েছেন কাকরাইল থেকে। সাত জনের মধ্যে একজন মওলানা এখনও পাসপোর্ট করেননি- একজন ইংরেজীর শিক্ষক ঢাকায় বদলী হয়ে গেছেন এবং

অপর একজন না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুন দুই জন জুড়লেও একজন অনেক দেরী হওয়ায় অন্য এক দলের সঙ্গে সফরে চলে গেছেন। সাথী কমপক্ষে ছয় জন প্রয়োজন অথচ আর কাউকে না পেয়ে এবং ইংরেজী জানা তেমন কেউ না থাকায় তারা নিরাশ হয়ে গেছেন। হঠাৎ করে তিনি আমাকে বললেন, স্যার আপনি যদি যেতেন তবে দুইটা অভাবই পূরণ হত এবং আমরা আবার নূতন করে চেষ্টা করতাম। ঘটনাটা ডিসেম্বর '০৮-এর প্রথম সপ্তাহের তিন তারিখের। হাঁ না কিছুই না বলে হেসে বাড়ীতে চলে এলাম। কিন্তু বিষয়টি মাথা থেকে দূর হলনা। বরঞ্চ ব্যাথার খোঁচা দিতে লাগল। নিজের অপছন্দ বাদ দিলেও বর্তমান অবস্থা কোনভাবেই হাঁ বলার পক্ষে নাই। তবু একটা কিন্তু কিন্তু ভাব মনের মধ্যে কাজ করতেই থাকল। এদিকে যেতে চাইলে সফরের জন্য আমার নিজেরও পাসপোর্ট করতে হবে। অর্ডিনারী করাতে হলেও দুই হাজার পাঁচশত টাকা ফিস লাগবে- সময় প্রয়োজন কমপক্ষে এক মাস। নিজস্ব তবলীগের গোপন তহবিলে হাত দিয়ে দেখি দুই হাজার পাঁচশত টাকাই আছে। আল্লাহর উপর ভরসা করে পরের দিন পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

পাসপোর্টের ফরম পূরণ করে অফিসে জমা দেব, ক্লার্ক ভদ্রলোক বললেন, স্যার আপনি তো আপনার চাকুরী সংক্রান্ত যে কোন একটা ডকুমেন্টের ফটোকপি ফরম এর সঙ্গে জমা দিলে আর্জেন্ট এর সুবিধা পাবেন। সুতরাং কাগজসহ কালকে জমা দেন। এ যে মেঘ না চাইতেই পানি। তার পরামর্শ মতো পরের দিন পেনসন সংক্রান্ত কাগজের একটা ফটোকপিসহ দরখাস্ত জমা দিয়ে ভেতরে গেলাম কবে আসব জানতে। ছেলেটি চিনে ফেলল। বলল, স্যার তিন দিন পর বিকাল চারটায় আপনার পাসপোর্ট আমি নিজে আপনার হাতে দিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ। অদ্ভুৎ ব্যাপার। এসব কিসের আলামত! সব কিছু এ রকম দ্রুত একের পর এক হয়ে যাচ্ছে কেন?

পরের দিন মওলানা মিজানের সঙ্গে দেখা। শুনলাম ভাঙ্গুরার সেই মওলানা কাল আসবেন পাসপোর্ট করতে, শুনে ভাল লাগল। দুইজন মওলানা জামাতে থাকলে কাজের খুব সুবিধা হবে। আমি দরখাস্ত করেছি শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে পড়লেন। বললেন, আপনি যদি যান তবে আর কেও যাক বা না যাক আমরাই চলে যাব। দেখি বলে হাত এড়ালাম। কিন্তু মনকে তো এড়াতে পারলাম না।

আমার পাসপোর্ট সময় মতই পেলাম কিন্তু ভাঙ্গুরার মওলানা এলেন না। তার বদলে তিনি যাবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। ততদিনে সাথীদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সবাই মারকাজ-এ একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যত বাধাই আসুক ২০/১২/০৮ আমরা ইনশাআল্লাহ কাকরাইল মারকাজ চলে যাবই। আমাদের দলের মধ্যে আমার ও আটঘরিয়ার হাজী মিজান ভাইয়ের সোয়াদ হয়নি। সিদ্ধান্ত হল, আমরা একেবারে সফরের সব প্রস্তুতি নিয়েই যাব। সোয়াদ

হয়ে গেলে বিদেশ সফরের পূর্বশর্ত হিসাবে দেশে যে প্রথম পনর দিন সময় লাগাতে হয় আমরা সে সময় লাগাতে থাকব এবং এর মধ্যে ভিসার জন্য দরখাস্ত করাসহ তাড়াতাড়ি ভিসা পাওয়ার প্রয়োজনীয় চেষ্টা তদবির করব।

সিদ্ধান্ত তো নিয়ে নিলাম কিন্তু টাকার কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত হয়নি। প্রথম দিন থেকেই গভীর রাতে আল্লার কাছে সাহায্য চাইতাম আর সারাদিন কি হয়েছে বা কতদূর হয়েছে সেটা জানাতাম। সময় মাত্র দশ/এগার দিন। ছেলে মেয়েরা সবাই দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। তাদের একত্র করে মাশয়ারা করা সম্ভব হলো না জন্য মোবাইলে মতামত নিলাম। সবাই সফরের পক্ষে ছিল জন্য পক্ষেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল।

আল্লাহ মেহেরবাণী করে টাকার ব্যবস্থা তার গায়েবী খাজানা থেকে করে দিলেন। এখন শুধু যাত্রা শুরুর পালা। কিন্তু না– এত সহজে সব হলনা। টেবুনিয়ার মনির ভাই যিনি গ্রামের লোককে এই সফরের পূর্বে মোষ জবাই করে খাইয়েছেন- তার টাকা নাই। ছেলে যেতে দেবে না। নয়নামতির সাইফুল ভাইও বিদেশ থেকে ছেলের টাকা আসলে যাবেন– টাকা আসেনি। এ দুজন এখন পিছু টানলেন। নূতন করে উনাদের তাসকিল করা হল। যা হোক শেষ পর্যন্ত ২১/১২/০৮ আমরা কাকরাইল চলে এলাম। নাম লিখালাম। পরের দিন সকালে সোয়াদ হয়ে গেল– প্রাথমিক হিসাবে ২,৪০,০০০ (দুই লাখ চল্লিশ হাজার) টাকা জমা দিতে বললেন মুরুব্বীরা।

জমার টাকা তুলতে যেয়ে দেখি, আমি, মওলানা মিজান ও টেবুনিয়ার হাজী মিজান ভাই পুরো টাকার ব্যবস্থা করে এসেছি। বাঁকীরা এক বৎসর ধরে ঘুরে নিরাশ হয়ে গেছেন তাই পুরো টাকাতো দূরের কথা জমা দেওয়ার পরিমাণ টাকাও সঙ্গে আনেননি। যা হোক সবার টাকা একত্র করে সব মিলিয়ে ২,১৫,০০০ (দুই লাখ পনর হাজার) টাকা জমা দিলাম এবং বাঁকীটা পরে দেব বলায় মুরুব্বীরা আর আপত্তি করলেন না। গোপনে বলে রাখি, হাজী সফিউল ইসলাম রঞ্জু ভাই তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সিলেটে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবেন বলে। হাজী মনির ভাই ছেলেকে বলে এসেছেন দুই/এক দিনের মধ্যেই ফিরে এসে বাড়ী বানানোর কাজ শুরু করবেন। আবার মাশোয়ারায় বসলাম। সিদ্ধান্ত হল রঞ্জু হাজী সাহেব সিলেট থেকে ঘুরে আসবেন এবং এখান থেকেই বাঁকী টাকার ব্যবস্থা করবেন। মনির ভাই দুই/তিন দিনের জন্য বাড়ী যেয়ে টাকার ব্যবস্থা করবেন। সাইফুল ভাইও ঢাকা থেকেই প্রায় সব টাকার ব্যবস্থা করলেন– অবশিষ্ট টাকার জোগার করা ও চোখের জন্য ডাক্তার এই দুটো কাজের জন্য তাকে একদিনের জন্য পাবনায় যাবার সুযোগ মঞ্জুর করা হল। আমরা সময় লাগাতে থাকব এবং এর মধ্যেই যার যা দরকার তার ব্যবস্থা করে নেব। মওলানা মিজান গোপনে অনেক টাকা জোগাড় করে রাখলেন যেন কারো টাকা কম পড়লে

তাকে ধার দিতে পারেন। এটা অবশ্য খুবই ভাল সিদ্ধান্ত। আল্লাহ যে কখন কাকে দিয়ে কি করেন তা বোঝা কঠিন। ফলে জামাত পুরাপুরি সবদিক দিয়েই তৈরি হয়ে গেল।

পনর দিনের প্রথম অর্দ্ধেক ঢাকায় পূর্ব রামপুরায় কাটালাম। ইতোমধ্যে ইয়েমেনের মারকাজ-এ ফ্যাক্স করা, টিকিটের খবর নেওয়া এবং এর পূর্বে যারা ইয়েমেন সফরে গিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় তথ্য নেওয়া শেষ করা হল। এখন শুধু ভিসার জন্য অপেক্ষা করা, আর মাঝে মধ্যে ইয়েমেন-এ ফোন করা।

প্রথমার্ধের দ্বিতীয় অর্দ্ধেক ঢাকার বাইরে যেতে হবে। ৭/০১/০৯ সকালে আমরা গাজীপুরে রওয়ানা হব। হঠাৎ রাত্রেই আমাদের ভিসার অনুমতি এসে হাজির। যেহেতু আমরা ইতোমধ্যেই পনর দিন ঢাকায় অবস্থান করেছি এবং ভিসা এসে গেছে তাই মুরুব্বীরা দয়া করে অবশিষ্ট ৭ দিনের বদলে চারদিন গাজীপুরে সময় লাগিয়ে চলে আসতে অনুমতি দিলেন।

ঢাকা থেকে চিটাগাং এর বাসের ভাড়া ৩০০/=(তিনশত) টাকা। অথচ ঢাকার বদলে চিটাগাং থেকে যদি প্লেনে উঠি তবে তের/চৌদ্দ হাজার টাকা ভাড়া কম লাগবে। তার উপর এয়ার এরাবিয়া-র ভাড়া পরিস্থিতি ভেদে বিভিন্ন রকম। শেষ পর্যন্ত আমরা ১৪/০১/০৯ তারিখের সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম থেকে যাওয়ার জন্য ঢাকা থেকে টিকেট করলাম। যাতায়াত মাথাপিছু ৪২,২০০ (বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা করে। অবশ্য পরে জানলাম, ঢাকার বদলে চট্টগ্রাম থেকে টিকেট করলে অতিরিক্ত আরো ১১০০ (এক হাজার একশত) টাকা কমে টিকেট করা যেত। কাকরাইলেই ডলার কেনাসহ সব কাজ শেষ করে ১৩/০৪/০৯ সকালে রওয়ানা হয়ে চট্টগ্রাম মারকাজে উঠে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে বলে ঠিক করা হল। এর ফলে বিশ্রামও হবে সময়ও পার হবে। এয়ার এ্যারাবিয়াতে রাজধানী সানা যেতে হলে সারজাহ্তে চব্বিশ ঘন্টা ট্রানজিট এবং ওখানে যাত্রীদের নিজের খরচে খাবার কিনে খেতে হবে। এই এক দিনের খাবার প্লেন থেকে কিনে খেতে মাথাপিছু ১৫০০-২০০০/-(পনরশত/দুই হাজার) টাকা খরচ পরবে। এজন্য চট্টগ্রাম থেকেই পাউরুটি, ডিম (সিদ্ধ ও ভাজা), জেলি, চিনি ও ফলমুল কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। খরচ হল মাথাপিছু একশত পঁয়ত্রিশ টাকা প্রতিজন এবং খাবার এত বেশি হল যে পরের দিন খাবার খাওয়ার পরও কিছু বেঁচে গেল। খাবার পানিও নেওয়া হল বেশি করে। হাজী মিজান তার ছোট ভাইয়ের গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। ঐ গাড়ীতেই চাপাচাপি করে মালপত্রসহ বাস ষ্ট্যান্ডে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা সবাই উঠে পড়লাম। এতক্ষণে মনে হল যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছি। গাড়ী ছাড়ামাত্র এক অভূতপূর্ব অনুভূতি সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। সকলের চোখে

পানি। কষ্টের না- অনাস্বাদিত, অপার্থিব, অপূর্ব এক শিহরণ জাগান ভাল লাগার অনুভূতি যা হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুরের অনুরণন তুলল গুণগুনিয়ে। মনে পড়ল হুজুর (স.) "আমি ইয়েমেনি" বলে যে দেশটিকে সম্মানিত করেছেন, যে দেশের সম্পর্কে কমবেশী চুয়াল্লিশটা হাদিস এরশাদ করেছেন, যে দেশের হেকমত ও ঈমান সম্পর্কে তিনি আপন যবান মুবারক-এ অনেক সনদ দিয়েছেন, আজ আমাদের গন্তব্য সেই মহান গৌরবান্বিত দেশ ইয়েমেন। মনে হল,

"পার হয়ে আসিলাম আজি নব শিখর চূড়ায়
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।"

হায়াতুস সাহাবার ১ম খণ্ডে ইয়েমেনবাসীদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটা সুন্দর ঘটনার কথা বিদায়াহ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনবাসীদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেবার জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) কে একটা জামাতসহ ইয়েমেন প্রেরণ করেন যাদের মধ্যে হযরত বারা (রা.)ও শামিল ছিলেন, হযরত খালিদ (রা.) ও তার জামাত ছয়মাস যাবৎ ইয়েমেনবাসী হামাদান গোত্রকে দাওয়াত দিলেন, তবুও তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন না। অত:পর হুজুর (স.) হযরত আলী (রা.) কে প্রেরণ করেন এবং হযরত খালিদ (রা.) ও যে সকল সাহাবী ফিরে আসতে ইচ্ছুক তাদের ফিরে আসার নিদের্শ দেন। হযরত বারা (রা.) থেকে যাওয়া অবশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা ইয়েমেনবাসীদের নিকট উপস্থিত হলে তারাও শহর থেকে বের হয়ে এলেন। হযরত আলী (রা.) অগ্রসর হয়ে পুরা জামাতসহ নামাজ আদায় করে জামাতকে এক কাতারে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি সামনে যেয়ে ইয়েমেনবাসীদের হুজুর (স.) এর চিঠি পড়ে শোনান যে পত্রে তিনি ইয়েমেনবাসীদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। চিঠি শুনে হামাদান গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সুসংবাদ হুজুর (স.) কে পত্র মারফত জানানো হলে পত্র পাঠ হুজুর (স.) সেজদারত হলেন। অত:পর মাথা উঠিয়ে বললেন, "আসসালামু আলা হামাদান" তিনি দুইবার কথাটি বলেন যার অর্থ শান্তি বর্ষিত হোক হামাদান গোত্রের উপর। সেই সোনার ইয়েমেন, শান্তির ইয়েমেন, বরকতের আর হেকমতের ইয়েমেনে আল্লাহ পাক সফরের জন্য আমাদের মঞ্জুর করলেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আমাদের জন্য আর কি হতে পারে। হৃদয়ের গভীর থেকে শুধু একটি শব্দই বের হল, আলহামদুলিল্লাহ!

চট্টগ্রামগামী কোচের ভাড়া বেশি কিন্তু সেবা ভাল, মাথা পিছু ৩০০/- (তিনশত) টাকা টিকেট। সঠিক সময়ে ৮/৯টা সিট খালি থাকা সত্বেও রওয়ানা হয়ে গেল একদম গেটলক হয়ে। মধ্যে বিশ মিনিট যাত্রাবিরতি– সেই সুযোগে আমাদের যোহরের নামায হয়ে গেল। চট্টগ্রাম মারকাজের পক্ষ থেকে

এস্তেকবালের গাড়ী আমাদের লাভ লেনের মার্কাজে নিয়ে গেল। খাবারও তৈরি। খেয়ে উঠতেই আছরের আযান। তারপর মাশোয়ারা। অবাক ব্যাপার। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা তো তাঁরা করলেনই উপরন্তু টিকেট কনফার্মেসন করিয়ে এবং কিছু হাদিয়াসহ আমাদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন পর্যন্ত – আমাদের কিছুই করতে দিলেন না। আল্লাহ তাঁদের উভয় জাহানে জাযা খায়ের দান করুন অপর্যাপ্ত পরিমানে।

এয়ারপোর্টের ঘটনা গতানুগতিক, মালামাল চেক করা, কাগজপত্র যাচাই বাছাই এইসব। আমাদের তো আবার ভিসা নাই। ফলে কাউন্টারের মহিলা বিব্রত। তাকে জানালাম যে, আমাদের দেশে ইয়েমেনি দূতাবাস নাই তাই সানা এয়ারপোর্টে পৌঁছে ভিসার জন্য ফিস জমা দিলেই ভিসা পাওয়া যাবে এবং এ সম্পর্কীয় ইয়েমেন সরকারের অনুমতিপত্র এবং হুদাইদার মারকাজের আহলে শুরার চিঠি তার হাতে দিয়ে বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু তিনি সাহস পেলেন না, নিজেই অফিসারকে ডাকতে চলে গেলেন। ফলাফল আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন। ভদ্রলোক ছুটে এসে আমাদের তার অফিসের ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং বসতে দিয়ে বললেন, 'আপনাদের কিছুই করতে হবে না। সব কিছু ঠিক করে বোর্ডিং কার্ডসহ প্রত্যেকের পাসপোর্ট এখানে দিয়ে যাচ্ছি।' আমরা নামায পড়তে চাইলাম। ফলে ঐখানেই নামায পড়ার ব্যবস্থা হল। একটু পর ঐ মহিলা এসে কাগজগুলো হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেলেন এবং তার একমাত্র ছোট্ট ছেলের জন্য দোয়া চাইলেন খুব করে। নিরাপত্তার দায়িত্বে যে অফিসার ছিলেন তিনি সকল বিষয়ে আমাদের অগ্রাধিকার তো দিলেনই এমন কি কোন সমস্যা হলে যোগাযোগের জন্য বার বার করে অনুরোধ করলেন। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে দোজাহানের মঙ্গল দান করুন।

সফর শুরু

মাগরেবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্লেনে উঠতে হল। একশত পঁচিশ সিটের প্লেন। সময় মেপে যাত্রা– সময় মতো সারজাহ উপস্থিতি। আমাদের ঘড়িতে তখন ১:৩০ মিঃ ওদের ১১:৩৫ মিঃ অর্থাৎ দুই ঘন্টার পার্থক্য। প্লেনেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম। এরোপ্লেন-এ ওদের আতিথেয়তা প্রত্যেকের জন্য শুধুমাত্র ছোট্ট আইসক্রিম এর কোটার এক কোটা পানি। এছাড়া যা কিছু দরকার সব ওদের কাছে ওদের রেটে কিনে নিতে হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের তা আর প্রয়োজন হল না। সারজাহ পৌঁছে খুবই কষ্টের মধ্যে ট্রানজিটের সময় কাটালাম। শুধু সকলকে একটু বসার জায়গা দেওয়া ছাড়া কর্তৃপক্ষের আর কোন দায়-দায়িত্ব নাই এবং একঘেয়ে বসে অপেক্ষার কষ্টকর সময় কাটানো ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা মাঝে মাঝে কিছু বিদেশীদের দ্বিনের দাওয়াত দিলাম এবং অবশেষে এই দুঃসহ ও একঘেয়ে চব্বিশ ঘন্টা ট্রানজিট শেষ করে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে সারজাহ ত্যাগ করলাম। রাত দুইটায় ইয়েমেনের রাজধানী সানায় পৌঁছলাম। চেকিং পয়েন্টে ভিসা লেখা যে কাউন্টার দেখলাম তা বন্ধ। এক্জিট লেখা দরজার কাছে লোক আছে। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে ফরম পূরণ করতে শুরু করেছি এরমধ্যে এক ভিন্ন দেশের তবলীগের সাথী এগিয়ে এসে আমাদের খবর নিলেন। ভেতরে যেয়ে আমাদের কথা বলতেই ওরা জানালেন আমাদের জন্য সানা মারকাজের প্রধান ভাই আব্দুল্লাহ আলভী কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছাবেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ জানালা খুলে গেল। কাগজপত্র সব উনারা নিজেরাই ঠিক করে নিলেন। ইয়েমেনে আমাদের সফরের মেয়াদ চার মাস অর্থাৎ একশত বিশ দিন। সেভাবেই ভিসা চাইলাম। কিন্তু এদেশের ভিসা প্রথমে স্বল্প মেয়াদে ইসু করা হয়। পরে আবার ফিস জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য ভিসা রিনিউ করতে হয়। সেভাবেই ভিসা হল। মাল সামানা বুঝে নিচ্ছি এরমধ্যেই সানার জিম্মাদার ভাই আব্দুল্লাহ আলাভী এসে হাজির। কয়েক মিনিট লেট জন্য বিনয়ের সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলেন। এয়ারপোর্টে দেখলাম তার যথেষ্ট পরিচিতি এবং ক্ষমতা, মাল সামানা পর্যন্ত অন্যরা নিয়ে যেয়ে তার সঙ্গে আনা দুইটা গাড়ীতে তুলে দিল। বাইরে এসে দেখি দারুন হাড় কাঁপানো কনকনে শীত। আমাদের প্রত্যেকের গায়ে মোটা গেঞ্জির উপর জামা ও ফুল সোয়েটার এবং তার উপর ওভার কোট। হাতে পায়ে মোজা। মাথায় গরম টুপি। তবুও শীত আমল দিতে নারাজ। ঠান্ডা বাতাসে ঐ অল্প সময়েই কাঁপতে শুরু করলাম। ভাই আলভী দ্রুত গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে রওয়ানা হলেন শীতের কামড় থেকে

বাঁচাবার জন্য। কিন্তু তেমন একটা লাভ হল না। যাহোক মারকাজে এসে বিছানা খুলে প্রায় দুই ঘন্টার মতো ঘুমানোর সুযোগ পাওয়া গেল।

৫:২০ এ আযান ৫:৪০ এ জামাত। নামায শেষ করে ঘরে এসে দেখি চা বিস্কুট ও খেজুর রেডি হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাত্রে যাদেরকে ঘুমাতে দেখেছিলাম তাঁদের কারো কারো সঙ্গে এসময় পরিচয় হল। মিসর, ফিলিস্তিন, লেবানন, মক্কা, মদিনা, সূদান, জিবুতি, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, বাহরাইন ইত্যাদি দেশের সাথী। যেসব সাথীর নাম আমাদের ভিসার কাগজে উল্লেখ করা ছিল তারাও এখানেই এখন আমাদের সঙ্গে। আমার পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম তার দেশের কথা। তিনি উরদুন অর্থাৎ জর্ডান থেকে এসেছেন। সবাই হাসি খুশি এবং মিশুক। বাংলাদেশী অর্থাৎ আলমী এজতেমার দেশের মানুষ হিসাবে আমরা বিশেষ মর্যাদা পেলাম। সবাই এসে হাত মেলালেন এবং গলায় গলা মিশিয়ে চুমু খেলেন। প্রথমে কেমন যেন সঙ্কোচ লাগলেও পরে আর অসুবিধা হল না। সাতটায় ইশরাক এর নামায শেষে মসজিদ থেকে বাইরে এসে দেখি ঘরের সম্মুখের নুড়িপাথর বিছানো ছাউনি ঘেরা স্থানটিতে লম্বা একটা দস্তরখানা বিছানো এবং সাথীরা সবাই ওখানে খেতে বসেছেন।

আমাদেরও 'ফুতুর' অর্থাৎ নাস্তা করার জন্য ডেকে নিল। প্রতি চার জনের জন্য এক সেট নাস্তা। একবার ব্যবহার্য প্লাষ্টিকের একটা ট্রের একদিকে আরব অঞ্চলের নাম করা মিষ্টি হালুয়াই তুহিনা (এক ধরনের সাদা ও গুড়া জাতীয় মিষ্টি, খেতে ভালই)। অন্যপাশে পনির এবং দেশী টক দই। বাটিতে করে টমেটো কুচি মিশিয়ে দিয়ে দানা দানা করে ডিম ভাজা নাম শুকশুকা তাও পরিমানে অনেক, সঙ্গে তন্দুর ও এক ধরনের লম্বা রুটি। যে যত খেতে পারে কোন আপত্তি বা অসন্তোষ নাই। বড় কেটলি ভরা দুই রকম চা ও ডজন ডজন চায়ের কাপ। এখানে দুধ চা কে বলে শায়ে দাউদী এবং দুধ ছাড়া লাল চা কে বলে শায়ে সোলেমানী। যে যত কাপ ইচ্ছা খেতে পারে। কোন প্রশ্ন তো করেই না উপরন্তু আরো বেশি করে খাওয়াতে চায়। এই রকম নাস্তা এখানে প্রত্যেক দিনই হয়েছে। তবে একদিন টমেটু-ডিমের (শুকশুকার) বদলে ডাউল হয়েছিল মাত্র। ১২:২০ মিঃ আযান। ১২:৪০ নামায। একটায় ফিরে এসে আবার দুপুরের খাবার। সরু লম্বা চালের পোলাও, আধখানা মুরগী ও সবজী। মুরগীর পরিমান এত যে তাতেই পেট ভরে যায়। সঙ্গে দই এবং তাও পরিমানে অনেক। এরপরে আবার বিকালে বিস্কুট ও চা। এশার নামায বাদ রাতের খাবার। রুটি তরকারী, ডাল, দই ও চা। সানা মার্কাজে যে চারদিন থাকলাম সব বেলায় একই রকম ব্যবস্থা। সবচেয়ে অপূর্ব ছিল রান্না মুরগী। গোস্ত ও হাড্ডি এক সঙ্গে কিন্তু হাত দিলেই হাড় থেকে পুরা গোস্ত মোলায়েম হয়ে খুলে আসে। অনেকটা গ্রীল করা মুরগীর গোস্তের মতো। তবে সাধারণ গ্যাসের চুলায় রান্না করতে দেখলাম।

চামড়া ছেলা মুরগীর গায়ে সামান্য তেলের প্রলেপ, কোন ঝোল নাই, মসল্লাও সামান্য অথচ লবন-মসল্লা গোস্তের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে। অতীব সুস্বাদু। রান্নাটা শেখার খুব ইচ্ছা হলেও সুযোগ পেলাম না। এছাড়াও মাঝে মধ্যেই খেজুর খাওয়া। এখানের এই দোতালা মসজিদটি বিরাট। ঈদের বড় জামাতের মত কাতার। নামাজ শেষ হলেও লোকজন খুব কমই বাইরে যান। মিম্বারের কাছে এসে বসেন এবং বয়ান শোনেন। বয়ান চলাকালীন কেউ উঠেন না, তা সেটা এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টাই হোক না কেন। প্রথমে মনে হয়েছিল যে এরা সবাই বোধ হয় তবলীগের সাথী। পরে দেখলাম গোটা ইয়েমেনে সব জায়গাতেই একই অবস্থা। স্থানীয় মানুষ, গাড়ীর ড্রাইভার, দোকানদার, পথচারী সবাই মোটামুটি পুরা সময় নামায শেষে মসজিদে বসে বয়ান শোনেন। উঠাউঠি নাই। তবে কেউ কোরআন পড়ছেন, বা তছবি হাতে মশগুল অথবা নামায পড়ছেন, কেউ নামায পড়ে চলে যাচ্ছেন অথবা মজমাতে এসে বসে যাচ্ছেন। কারো মুখে কথাবার্তা নাই বললেই চলে। পরিবেশটাই অন্য রকম। আমাদের দেশের সঙ্গে একদম মিল নাই। সবাই নিজের আমল নিয়েই সন্তুষ্ট। অন্যে কি করল বা আমার আমলের সময় অন্য কে কি করছে সে নিয়ে কারোই কোন মাথাব্যথা নাই।

লোহিতসাগরের তীরে এবং সৌদি আরবের দক্ষিণে অবস্থিত অভিন্ন সীমান্তের দেশ ইয়েমেন আমাদের দেশের চেয়ে ছয়গুণ বড় অথচ লোক সংখ্যা আমাদের চেয়ে ছয় ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ আড়াই কোটি। এখানে যেমন বরফ পড়া শীতের অঞ্চল আছে তেমনি আছে ৪৯° তাপমাত্রা সম্পন্ন মরু অঞ্চল। অগনিত পাহাড় ঘেরা অঞ্চল যেমন আছে তেমনি আছে সমতল ভূমিও। সানা, রেদায় ইত্যাদি শীত প্রধান অঞ্চল হলেও হুদাইদা, এডেন, হাজরা মাউত ইত্যাদি গরম প্রধান অঞ্চল। প্রাচীনকাল থেকেই মূল আরব ভূখন্ডের ব্যবসা বাণিজ্য মূলত লোহিতসাগর তীরে অবস্থিত ইয়েমেনের এডেন ও অন্যান্য সমুদ্র বন্দর দিয়েই চীন ও আফ্রিকার সঙ্গে চালু ছিল। এ কারণে আরব ভূমিতে ইয়েমেনের গুরুত্ব ছিল চিরকালের। বানরের পিঠাভাগ এর ফলে কিছুকাল আগে ইয়েমেন উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ব্লকে বিভক্ত থাকলেও এখন তা অখন্ড এবং গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা পরিচালিত। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, আরব ভূমি অখন্ড থাকাকালীন ইয়েমেনের তুব্বা গোত্রটি বসবাসের প্রয়োজনে ইয়াসরিব অর্থাৎ বর্তমান মদীনাতুন নববীতে হিযরত করছিলেন। সেই হিসাবে মক্কা বিজয়ের পূর্বের কিছু মুহাজীর সাহাবী এবং আনসার সাহাবীরা প্রায় সবাই ছিলেন মূল ইয়েমেনিদের বংশধর। এ কারণেই মদীনার সঙ্গে ইয়েমেনের চালচলন ও আচার আচরণের মিল সহজে চোখে পড়ে। আমরা ইয়েমেনে আসতে পেরে মূল আনসার সাহাবীদের বংশধরদের যেমন সাক্ষাত পেলাম তেমনি সাহাবীওয়ালা আখলাক ও

চরিত্র অবলোকন করার বিরল সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করালাম। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশে সফর-এর ফয়সালা হলে এই বিরল সৌভাগ্য আমাদের নসীবে হত না, সুতরাং তাঁর পাকদরবারে এ জন্য লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই।

দুপুরে আমরা মাল সামানা ঠিক করলাম। শীতের কাপড় চোপড় এবং অতিরিক্ত মালামাল সানাতেই রেখে যাচ্ছি। কারণ হুদাইদা অর্থাৎ ইয়েমেনের প্রধান মারকাজ যেখানে এজতেমা হবে সেখানের আবহাওয়া অন্য রকম। এখনই গরম আমাদের দেশের প্রায় চৈত্র মাসের মতো। হঠাৎ করে ইয়েমেনি এক তরুন প্রস্তাব দিল এখান থেকে লোহিত সাগর মাত্র পনর মিনিটের ড্রাইভ। আছরের নামাযের পরে যেয়ে সমুদ্র সৈকতে অনেকক্ষণ থাকাও যাবে এবং ফেরাউনের ডুবে মরার সেই ঐতিহাসিক জলরাশি ছুঁয়ে আসা যাবে। লোহিত সাগরের এপারে ইয়েমেন আর ওপারে মিশরসহ আফ্রিকা। মুসা (আ.) এর সেই ঘটনার কথাতো কোরআন পাকেই আছে। সুতরাং সবাই আছরের নামায শেষে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীর রিজার্ভ ভাড়া দুইশত ইয়েমেনি রিয়েল, আমাদের দেশের ছিষট্টি/সাতষট্টি টাকার মতো। সতের মিনিট লাগল। অবাক হয়ে দেখলাম সেই অনন্ত জলরাশি যা একদিন বারটি গোত্রের জন্য বার ভাগে বিভক্ত হয়ে মুসা (আ.) ও ছয় লক্ষ বনিইসরাইলকে শত্রুমুক্ত করেছিলো এবং কিছুক্ষণ পরে ফেরাউন ও তার সতের লক্ষ সাথীদের ডুবিয়ে মেরে ছিল। অথচ সেই জলরাশি এখন কত শান্ত স্নিগ্ধ উছলা হয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো লাজুক হাসি নিয়ে আমাদের স্বাগত জানাল। উঁচু পাকা রাস্তার ধারে বড় বড় পাথর সাজিয়ে দিয়ে তার অশান্ত রূপটিকে যেন সযত্নে দমিয়ে রাখা হয়েছে। প্রচুর পার্ক ও দৃষ্টি নন্দন বাগানসহ সুন্দর সুচারু রাস্তা– তাতে সচেষ্ট সৃষ্ট সবুজের আলপনা। স্থানীয় মানুষও প্রচুর দেখলাম যারা অবসরকে বিনোদনে ভরিয়ে নিতে ব্যস্ত। এই সুযোগে সূর্য পাটে বসল আর আমাদেরও ফেরার সময় হয়ে গেল। অন্য একটা ট্যাক্সি থামালাম। একই ভাড়া। কিন্তু এবার যেটা চোখে পড়ল সেটাই বড় দুর্ভাগ্যজনক। ড্রাইভারের গালের একদিকে অর্থাৎ মুখের একদিকে গোটা টমেটু (মার্বেল নয়) ঢুকিয়ে রাখলে গাল যেমন ফুলে থাকে ঐ রকম উঁচা হয়ে আছে। পানের রস খাওয়ার (গেলার) মতো একটু পর পর ঢোক গিলছে। কোন ভাবেই কৌতুহল না মিটিয়ে পারা গেল না। মাঝে মধ্যেই পথ চলতি কাউকে কাউকে সবুজ পাতা ছিড়ে মুখে দিতে দেখেছি। জানলাম, এখন এখানে এই অদ্ভুৎ নেশার প্রচলন হয়েছে। সব বয়সের মানুষ এক ধরণের গাছের তাজা সবুজ পাতা মুখের মধ্যে গাদা গাদা নিয়ে জমা করে এবং রসিয়ে রসিয়ে তা খায়। এতে নাকি ঘুম ধরেনা, এক ধরনের আনন্দ বোধ হয়। পরে এজতেমার মাঠের চারপাশে প্রচুর সাধারণ মানুষ দেখেছি যারা এজতেমা দেখতে এসেছে এবং বাইরের প্রাচীরের ধারে বসে থেকে বয়ান শুনছে আর পাতার রস গিলছে। শুনলাম এর নাম কাদ। চা পাতার মতো এক রকমের পাতা

যা পাহাড়ের অনেক উপরে জন্মান হয়। এ গাছের কচি পাতাই এই নেশার উপকরণ। সন্ধ্যার পর আরো এক চমক অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। গত বৎসর যে ইয়েমেনি জামাত চিল্লার সফরে পাবনা গিয়েছিলেন এবং অন্যান্য মসজিদের সঙ্গে আমাদের মসজিদেও বয়ান করেছিলেন সেই জামাতের দুই/তিন সাথী খবর পাঠিয়েছেন যে, পাবনার জামাত এসেছে সে খবর তারা পেয়েছেন এবং হুদায়দা এজতেমাতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। এই জামাত খুব তাসকিল করেছিল ইয়েমেনের জন্য। মওলানা মিজানের সঙ্গে তাদের ভাল সম্পর্ক হয়েছিল এবং পরস্পরের মধ্যে মোবাইল যোগাযোগ চালু ছিল। ফলে আমরা চেনা লোকের দেখা পাব জন্য খুব খুশি হলাম। পরের দিন বুধবার ভোরে এজতেমার মাঠে যেতে হবে। সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

সকালেই হুদাইদার মার্কাজের উদ্দেশ্যে আমরা সাত জন রওয়ানা হলাম। বেশ কিছুদূর এসে রোড সাইন খেয়াল করলাম, ওখান থেকে হুদাইদা ২৫০ কি.মি.। অর্থাৎ সর্বমোট দূরত্ব ২৭০-২৮০ কিলোর মধ্যেই হবে বলে মনে হল। ড্রাইভার জানাল ২৮০ কি.মি. এর কথা। অল্প কিছুক্ষণ পরই পাহাড় কেটে তৈরি করা আঁকাবাঁকা ঘোরানো পথে আমাদের গাড়ী উঠে এল। আমরা তিনজন এ ধরনের পথের সঙ্গে পাকিস্তান সফরে পরিচিত ছিলাম। বাকীদের মধ্যে একজন খুব ভীত হয়ে পড়লেন এবং মাথা নিচু করে ঘুমিয়ে সময় কাটালেন। পাহাড়ের চমৎকার দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে করতে দেখলাম, প্রচুর না হলেও পাহাড়ী নানা ধরনের গাছের সঙ্গে বেশ কিছু আম এবং বকনীম গাছ। এমনকি প্রচুর সতেজ কলা বাগানও চোখে পড়ল। প্রায় সব আম গাছেই প্রচুর মুকুল এসেছে। মনে হল, আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে এবং রেজেকে থাকলে স্থানীয় আম বাড়ী যাওয়ার আগেই খাওয়া যাবে। পথের এক বাঁকে ছোট একটা মসজিদ। তার পাশের পাহাড়েই মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা ধোয়ার মতো। অত উঁচুতেও এই মসজিদটিতে ট্যাপের পানির ব্যবস্থা। আমরা ওজু করে যোহরের নামায পড়লাম। অপর এক গাড়ীর সাথীরা এবং আমাদের ড্রাইভার এক আযানে দুই একামতে যোহর এর সঙ্গে আছর এর নামাযও পড়ে নিল। আমরা হুদাইদা মারকাজে যেয়ে আছরের নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বিকাল প্রায় চারটার দিকে হুদাইদা মারকাজে এসে পৌছালাম। দেতালার এক ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল। ঘরে আরো বিদেশী সাথীরা ছিলেন। সঙ্গে বাথরুম; প্রচুর পানি। হাত মুখ ধুয়ে নিতেই খাবার এসে গেল। ডাল, রুটি, দই খেতে বেশ ভাল লাগল, মনে হয় বেশি ক্ষুধা লেগেছিল। হুদায়দা বেশ গরম এলাকা। প্রচুর ফ্যান ঘুরছে তবু গায়ে কাপড় রাখতে কষ্ট হচ্ছে। পরে অবশ্য ঠিক হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর ইয়েমেনি সেই তবলীগের সাথীরা এসে দেখা করলেন। আগামীকাল ২২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বাদ আছর এজতেমা শুরু

হবে। হাতে সময় খুব অল্প থাকায় তারা কিছুক্ষণ পরেই চলে গেলেন। আমরাও তাড়াতাড়ি খেতে গেলাম। এ বেলা ডিমের বদলে ডাউল এবং নূতন দুইটা আইটেম জয়তুনের তেল এবং পাকা ও সেদ্ধ করা জয়তুন ফল খাবারে যোগ হল। খেয়াল করে দেখলাম, এসব রাজসিক খাবার খেয়ে এই কয়েক দিনের মধ্যেই ঝুলে পড়া চামড়া আবার যুবক বয়সের মতো টাইট হয়ে যাচ্ছে। ঘাবড়ে গেলাম কারণ এর পরের ষ্টেপ মধ্য প্রদেশ স্ফীত হয়ে উঠা বা ভুড়ি হয়ে যাওয়া। এটা কোনক্রমেই হতে দেওয়া যাবেনা। দেখা যাক কি করা যায়।

বিরাট বড় মাঠে এজতেমার আয়োজনও ছিল বিশাল। মাত্র ৫ বৎসর হল এই মাঠে এজতেমা শুরু হয়েছে, অথচ এর মধ্যেই বিরাট বিরাট পাকা ডরমেটরী বানানো হয়েছে বিদেশী মেহমানদের থাকার জন্য। প্রচুর পাকা গোসলখানা ও পায়খানা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বরফ দেওয়া পানির ট্যাঙ্কিতে খাওয়ার পানির ব্যবস্থা। এছাড়া এজতেমার মাঠের বিরাট প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে লোহার ফ্রেমের উপরে টিনের ছাউনি দিয়ে। কিন্তু নিচে শুধুই বালি। তার উপরে নীল ত্রিপল দিয়ে ঢেঁকে দিলেও গোটা মেঝে বালুময়। সৌদি আরব ও আশে পাশের দেশগুলো থেকেও প্রচুর মেহমান এসেছেন প্রায় সবাই নিজেদের গাড়ীতে। দামী কাপড় চোপড় পড়া অথচ নির্দ্বিধায় ঐ বালুর মেঝেতে বসে নামায আদায় করছেন, বয়ান শুনছেন। আমাদের প্রথম দিকে একটু সংকোচ হল। কিন্তু পরিবেশের কারণে আমরা ছিলাম নিরুপায়। তবে মজার কথা, ঐ বালু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ে ঝাড়া দিলে আর কোন বালু থাকে না।

এজতেমা শুরু হয়েছিল বৃহস্পতিবার বিকালে বাংলাদেশের মওলানা ফারুকের বয়ান দিয়ে এবং শনিবার সন্ধ্যার বয়ানের পর মোনাজাত হবার কথা থাকলেও পরের দিন রোববার সকাল এগারটার দিকে আখেরী বয়ান শেষে মোনাজাত হল। বাংলাদেশ থেকে মওলানা ফারুক সহ চারজন মুরুব্বী এবং ইন্ডিয়া থেকে মওলানা আহমদ আলী লাট সাহেবসহ কয়েকজন মুরুব্বী এসেছিলেন। শুক্র ও শনিবার ভারতের লাট সাহেব বাদ মাগরিব বয়ান করলেন। তিনিই পরের দিন মোনাজাত করেছিলেন। মাশোয়ারার মাধ্যমে ঠিক হল যে সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের জন্য কেন্দ্রীয় এজতেমা হুদাইদাতেই হবে।

এখানে এসে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যার কোন ব্যাখ্যা আমি পাইনি। একটা ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছিনা। এজতেমার দ্বিতীয় দিনে প্রায় সবাই মাঠে চলে গেছেন। বিরাট ডরমেটরীতে তিন/চার জন সাথী বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করছেন। এমন সময় একজন বিদেশী সাথী হলের এক কোনায় আমাদের আমিরের কাছে এসে সরাসরি বললেন, এখানে কি বাংলাদেশের জামাত আছে? তিনি সম্মতি জানালে, সেই সাথী খবরের কাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট তার হাতে দিয়ে বললেন, মদীনা থেকে আপনাদের জন্য এই উপহারটা পাঠিয়েছেন।

প্যাকেট দিয়েই তিনি চলে গেলেন। রাত্রে আমরা খবরের কাগজে মোড়ানো প্যাকেট খুলে তার মধ্যে বারটা খেজুরের প্যাকেট পেলাম। আমাদের জানামতে মদীনা থেকে কারো পাঠানোর কথা নয়, পাঠানোর মতো কেউ নাইও। অথচ বিশেষভাবে বাংলাদেশের জন্য এই খেজুরের প্যাকেট কে পাঠালো? সে জানলো কি করে যে, অত হাজার হাজার লোকের মধ্যে ছয়জন বাংলাদেশী কোথায় আছে? আবার মাথাপিছু প্যাকেটও দুইটা হিসাবে বারটা। সবই কি এ্যাকসিডেন্টাল? এর মধ্যে কি আল্লাহর মেহেরবানী ও কুদরত নাই? সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম, বরকত হিসাবে সবাই এই খেজুর নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাব।

ইয়েমেন বালু, পাথর আর পাহাড়ের দেশ। এখানে ইটের কোন কারবার নাই। তবে প্রচুর কুচি ও ছোট পাথর আছে যে পাথরের তারা উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। কুচি পাথর ও ছোট পাথরের সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে তারা ঘর ও প্রাচীর বানানোর উপযোগী বিভিন্ন সাইজের ব্লক তৈরি করেছেন। এই ব্লক সিমেন্ট বালু দিয়ে গেঁথে দিলেই সুন্দর ঘরবাড়ী ও প্রাচীর হয়ে যাচ্ছে। আর এ পাথর ও বালু তাদের নিজেদের কাছেই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। প্লাষ্টারিং প্রায় কোন বাড়ীঘরেই চোখে পড়ে না। তবে কেউ কেউ বিভিন্ন ভাবে রং করে রেখেছেন প্রাচীর ও বাড়ীর দেওয়ালে। শহরে প্রায় অধিকাংশ বাড়ীই কমপক্ষে দোতলা, তিনতলা, তাতে লোহার দরজা ও জানালা যা দেখতে সুন্দর, রঙ্গীন ও নকশাদার। ছাদগুলো আর সি সি বিম এর উপরে কাঠের পাটাতন, তবে উপরে ৪ ইঞ্চি সিমেন্টের ঢালাই। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পিলারের উপর সিমেন্টের আর সি সি বিম দিয়ে তার উপর মোটা কাঠের বর্গা ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন বাড়ীতে গোটা গোটা চতুষ্কোন পাথরের টুকরাও ব্যবহার করা হয়েছে। বাড়ী ও প্রাচীর তৈরিতে ব্যবহৃত পাথর বাইরের দিকে সমান হলেও অন্য দিকগুলো বিভিন্ন সাইজের এবং দেখতে আমার কাছে ভালই লাগছিল। তবে খুব কম বাড়ীতেই এই বিলাস বহুল কাজ করানো হয়েছে।

বলতে ভুলে গেছি, সানাতে অবস্থানকালে দ্বিতীয় দিনেই আমরা মেডিক্যাল করালাম। রক্তের এইচ আই ভি পজিটিভ আছে কিনা তার পরীক্ষা করার জন্য (অবশ্য এ রিপোর্ট আমরা দেশ থেকেই করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরও ওরা আবার পরীক্ষা করল।) আমাদের ছয় জনের ফিস লাগল ২৭০০০/-(সাতাশ হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল। ফেরার পথে আমরা প্রত্যেকে একশত ডলার করে ছয়শত ডলার ভাঙ্গালাম। পেলাম ১,২০,৫০০/=(এক লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশত) ইয়েমেনি রিয়েল। আমাদের এক টাকায় মোটামুটি তিন রিয়েল। এখানেই রক্ত দিতে যেয়ে আমার খুব মজা হল। একটা ইন্টার্নি ডাক্তার মেয়ে আমার রক্ত নিতে এল। আমি ডান হাতের বদলে বাম হাত থেকে রক্ত নিতে বললাম। ডাক্তার তো! গম্ভীর হয়ে ডান হাত থেকে রক্ত নিতে গেল। বহুবার সন্ধ্যানীতে রক্ত দেওয়া

হাতে যেই সে সিরিঞ্জ ঢুকিয়েছে যথারীতি সুচ শিরা ভেদ করে ওপারে চলে গেল, রক্ত আসাই বন্ধ হয়ে গেল। আমি তো হাসছি। মেয়েটি থতমত খেয়ে আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি যেয়ে ইনচার্জ ডাক্তার কে ডেকে আনল। তিনিও দুই বার চেষ্টা করলেন হলনা। আমি হেসে বললাম, বাম হাত থেকে নেন, পাবেন। তিনি বাধ্য হয়ে বাম হাত থেকে রক্ত নিলেন। এ রকম ঘটনা এর আগেও কয়েকবার হয়েছে। আমার পরে সিরিয়াল মওলানা মিজানের, তিনি কোনদিন এভাবে রক্ত দেননি- খুব ভয় পেয়ে গেছেন। আমি তাকে অনেক সাহস দিয়ে রক্ত দেওয়ালাম। মেয়েটি কিন্তু আর আসলই না। রক্ত দেওয়া শেষ হলে সবাই ফিরে এলাম। রিপোর্ট পরের দিন দেবে। অবশ্য পাকিস্তানী জামাতের রিপোর্ট আমরা নিয়ে এলাম। ওদের ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) করে মাথাপিছু নিয়েছে সাত জনের ৩৫,০০০/-(পঁয়ত্রিশ হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল। কারণটা বুঝলাম না।

বিকেলে পাসপোর্ট জমা দিতে হল পুলিশ রিপোর্ট এর জন্য। ওখানে ৬৫০/-(ছয়শত পঞ্চাশ) হিসাবে ৩৯০০/-(তিন হাজার নয়শত) ইয়েমেনি রিয়েল ফিস দিলাম। তবে থানায় যেতে হলনা, ওরাই নিয়ে গেল এবং পরের দিন সানার কর্তৃপক্ষ সিল দেওয়া পাসপোর্ট নিয়ে এলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে কোন রিপোর্টই খারাপ না হওয়ায় কোন ঝামেলা হল না।

সানাতে আমরা দুপুরে পোলাও এর সঙ্গে মুরগী খেতাম। এখানের মুরগীর বদলে গরু/দুম্বার গোস্ত। একই রকম সুন্দর রান্না। হাত দিলেই মাখনের মতো গোস্ত হাতে উঠে আসে। শেখার ইচ্ছা থাকলেও তা আর হয়ে উঠলনা। আসলে প্রায় সব সময়ই বিভিন্ন আমল থাকে তো রান্না শিখব কখন? তবু যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হলো বিশেষ ধরনের চুলা দরকার। এরা চার/পাঁচ থাকের গ্যাসের চুলায় গোটা মুরগীর গায়ে হালকা মসল্লা ও তেল দিয়ে শিকে গেথে সেই শিকসহ মুরগী গ্যাসের আগুনের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দীর্ঘ সময় সেদ্ধ করে। মাঝে মধ্যে মুরগীর গায়ে হালকা মসল্লা ও তেল মাখিয়ে দেয় এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঁচ কমবেশী করে রান্না শেষ করে। ফলে তাপ নিয়ন্ত্রণসহ সবকিছু মাত্র একজনেই করে। একই সঙ্গে পনর/বিশটা মুরগী রান্না করে কোন ঝামেলা ছাড়াই। অনেকটা গ্রীল করার মতো করে, আমাদের দেশে আমরা ইদানিং বড় বড় শহরে এ ধরণের রান্না দেখছি।তাছাড়া এই কাজের ফাঁকে অন্য কাজও করা যায় স্বাভাবিকভাবেই।

জয়তুন এখানে টিনের কন্টেইনারে বিক্রী হয়। তেলের মধ্যে জয়তুন ডুবান থাকে। পাকা অথবা সিদ্ধ দুই রকমের জয়তুনেরই প্যাকেট পাওয়া যায়। পছন্দের সাইজ মতো টিন খুলে জয়তুন তুলে পৃথক করা হয় এবং তেল অন্য পাত্রে রাখা ও খাওয়া হয়। দই এর একটা ইংরেজি প্রতিশব্দ সাওয়ার মিল্ক অর্থাৎ টক দুধ তা এখানে একদম সত্যি। 'একবার ব্যবহার' গ্লাসে করে যে দই বিক্রী হয় তা বেশ

টক। স্থানীয়রা এটাই পছন্দ করে। দাম পঞ্চাশ রিয়েল আমাদের প্রায় সতের টাকার মতো। আমরা চিনি মিশিয়ে নিয়ে দই খেতাম। এ দেশীয় সাথীরা আমাদের সঙ্গে বসে সবকিছু খেলেও চিনি দেওয়া দই খেতনা।

এজতেমা শেষে কয়েক'শ জামাত দেশে বিদেশে রোখ নিয়ে চলে গেল- শুধু বাদ থাকল আমাদের ছয় জনের এই বাংলাদেশী জামাত ও দুইটা পাকিস্তানী জামাত। কোথায় কোন জামাতের রোখ হয়েছে ইত্যাদি যাচাই শেষ করে তারপরে রোখ দিতে চাইলেন বলে আমরা তিনটা জামাত আবার হুদাইদার মারকাজে ফিরে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, গরম শহরে না ঠান্ডা শহরে রোখ হয় তার উপর ভিত্তি করে কাপড় চোপড় ও মাল সামান নিলেই ভাল হবে। মাশোয়ারাতেও এটাই ঠিক হল। হুদাইদা ছাড়া হাজরা মাউত এবং আদন (এডেন বন্দর) ইত্যাদি হল গরম আবহাওয়ার শহর। রদায়, মাহয়িদ, সানা ইত্যাদি সব বেশ শীতের শহর। এখন অপেক্ষার পালা। পরের দিন বিরতি। শুধুই বিশ্রাম। হঠাৎ করেই ভাই ফাহিম এসে হাজির। যে গাড়ীতে আমরা সানা থেকে এসেছিলাম সে ঐ গাড়ীর মালিক ও ড্রাইভার। চিল্লার সাথী। বাংলাদেশেও এজতেমাতে গেছেন ও চিল্লা দিয়েছেন। টিপটপ মানুষ – দেখে বোঝাই যায় না। আসলে পুরা ইয়েমেনের আহলে শুরার যিনি প্রধান সেই ভাই সালেহ মকবিল নিজেও প্রথম দিকে এ রকম ছিলেন। তবলীগ করতেন না তবে কেতাদুরস্ত মানুষটি তবলীগ ওয়ালাদের পছন্দ করতেন। সুযোগ পেলেই নিজের গাড়ীতে করে সাথীদের বিভিন্ন গন্তব্যে নিজ খরচে পৌঁছে দিতেন। এভাবেই সূচনা। পরে আল্লাহর মেহেরবানী হল। তবলীগে ঢুকলেন এবং শেষ পর্যন্ত পুরা দেশের প্রধান ও ফায়সাল। বাংলাদেশে অনেক বার গিয়েছেন এবং আমাদের প্রায় সব মুরুব্বীর সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক আছে। উনার ডান হাত তার ছেলে লাবিব কেন্দ্রীয় মারকাজে বর্তমানে কাজ করছেন এবং তিনিই এবার বিদেশীদের দেখভালের পুরা দায়িত্ব পালন করছেন। মাঝ বয়সী হাসিখুশি মানুষ। লাট্টুর মতো দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন, কোন বিরক্তি নাই। পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেটের সময় বাড়ানো, পুলিশি রিপোর্ট, মেডিক্যাল, থাকা ও খাওয়াদাওয়া সবই তার জিম্মায়। আমরা শুধু প্রয়োজনীয় অফিসের ফিস দিয়েই খালাস।

যাহোক ফহিম এসেই আমাদের খুঁজে বের করলেন। সানা থেকে হুদাইদা আসার পথেই আলাপ বেশ জমে গিয়েছিল- প্রস্তাব দিলেন আজ তিনি বাইরের কোন ভাড়া তুলবেন না। আমাদের সঙ্গে সময় কাটাবেন এবং সেজন্য আমাদের সমুদ্র সৈকতে নিয়ে যেতে চাইলেন। ফলে সময়টা অন্য রকম হয়ে উঠল। কয়েকটি ইন্দোনেশিয় এবং থাইল্যান্ডের ছাত্র ছিল। ওরাও যেতে চাইল। ফলে এগার জনের জামাত- চললাম সমুদ্রে। আমি ও মুনির ভাই ছাড়া সবাই সমুদ্রের পানিতে নেমে খুব মজা করলেন। রঞ্জু হাজী সাহেব তো উচ্ছল হয়ে গেলেন।

তখন জোয়ারের সময়। পানি ক্রমেই বাড়ছিল ও তীরে এসে ছলাত ছলাত করে আছড়ে পড়ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ীতে করে বেশ কিছু স্থানীয় পারিবারিক ভ্রমন পিয়াসীরা এসে সৈকতে জমলেন। কিন্তু অর্ধউলঙ্গ নয় বরং খুব শালীন পরিবেশ। শরিয়া মাফিক বোরখা, হাত মোজা ও পা মোজা ছাড়া একটা মেয়ে কোথায়ও দেখলাম না। পাঁচ/ছয় বছরের ছোট বাচ্চারা শুধু আমাদের দেশের মতো পোষাকে– তাও প্রায় প্রত্যেকেই পানির জন্য নিরাপদ জ্যাকেট অথবা লাইফ বয়া নিয়ে বাপ চাচার সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে দাফাদাফি করছে।

রাস্তাগুলো খুবই প্রশস্ত ও ঝকঝকে। কোথায়ও কোন ময়লা বা নোংরা নাই। কিছুদূর পরপরই পুরুষ অথবা মহিলা কর্মিরা রাস্তার ময়লা খুটে তুলে নিচ্ছে। এ সব মহিলা বোরখা ছাড়াও হাত মোজা পা মোজা পড়ে কাজ করছে। বেহায়া বেলেল্লাপনা মার্কা ছবি তো দূরের কথা, বড় মহিলাদের ছবি ও দুই/একটা বিদেশী কোম্পানীর সাইন বোর্ড ছাড়া কোথায়ও চোখে পড়েনি– তাও মার্জিত ও শালীন। দোকানেও ক্যাসেট টিভির কোন অত্যাচার নাই। কেমন যেন অন্য রকম একটা স্নিগ্ধ সুন্দর পবিত্র পরিবেশ, বাংলাদেশের মানুষ তো আমেরিকান ইংলিস হওয়ার প্রত্যাশী। সুতরাং তারা এটা বিশ্বাস করবে কি?

মরুর দেশে : কারাভাঁর যাত্রা হল শুরু...

রাত্রে আমাদের গন্তব্যের ফয়সালা হবে। এদিকে বিকেলেই সাথী ভাই আব্দুল্লাহ্ আলী হাসান নাজ্জারী এসে হাজির। আজ সহ ছয় বার আসা হল। এর মধ্যে এজতেমার মাঠেই দুইবার, সেখানেও মেহমানদারীর কমতি নেই। তরমুজ খাইয়েছেন– এক/দুইটা নয় ছয়/সাতটা করে। তাদের ইচ্ছা আমাদের জামাতকে তাদের এলাকায় নিয়ে যাবেনই। শেষ পর্যন্ত তাদের আগ্রহ ফলবতী হল। বিশ দিনের জন্য আমাদের প্রথম রোখ (গন্তব্য স্থল) হল মরুময় মরুকন্যা কানাবেজ এ। সেখানে যেতে হবে জন্য কারো কারো মন হয়ত খুঁত খুঁত করতে পারে তাই মওলানা সুন্দর একটা ফারসী বয়াত শুনিয়ে দিলেন। "পীরে মান খোশাস্ত এহতেমাল বসাস্ত"। সরল অর্থে গন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন না তুলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়াই কেন প্রধান সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বুঝালেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তার বয়াতের অনুবাদ এ ভাবে করলে কেমন হয় :-

"আমার পীর যাতে খুশী সেটাই চূড়ান্ত
বিকল্প পথ যা কিছু ছিল সবই ভ্রান্ত।"

এরপরে আর কোন বিকল্প চিন্তা কারো মাথায় আসার প্রশ্নই উঠেনা। গন্তব্য কানাবেজ, যেতে হবে। এখান থেকে দূরত্ব হুদাইদা বন্দরের পাশ দিয়ে আশি কিলোমিটার। পরের দিন সকালে নাস্তা শেষে গাড়ীর পেছনে মাল সামানা তুলে আমরা সবাই টয়োটা ষ্টারলেট ২৪০০ হাফ ট্রাক গাড়ীতে বসে পড়লাম। এ রকম হাফ ট্রাক এখানের পথে ঘাটে অসংখ্য। সব কাজই হয়। যাত্রীও বহন করা যায় সাথে মালও। মালিক ও চালক হাসান ভাইয়ের ছোট ভাই। কানাবেজ থেকে পাকা রাস্তা শেষে ধুলি ধুসরিত কাঁচা মেঠো পথে আরো আট/দশ কিলো যেতে হল। তারপর মসজিদ 'মসজিদে নাজ্জারী'। ছোট খাট মসজিদ। একশত/একশত পঁচিশ জন মানুষ একত্রে নামায পড়তে পারবে। প্রাচীন আমলের এই মসজিদটি পাথরের চতুস্কোন টুকরা দিয়ে তৈরি। আলহামদুলিল্লাহ বলে নেমে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার ছোট বড় ছেলেরা এসে কাইফা হালুকা (কেমন আছেন) বলে হাত মিলাতে লাগল। কেমন যেন ভি আই পি, ভি আই পি ভাব। সবাই বিশেষ একটু সমীহের চোখে দেখছে। ফিসফিস করে বলছে 'বাংগালাদেশ বাংগালাদেশ'। বিদেশে এসে নিজের দেশের কারণে এত ভাল লাগা আর এত ভালবাসা পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ধারণা করা যায়নি। এ মসজিদে তিনদিন থাকলাম। প্রত্যেক দিন পাঁচ বেলা হিসাবে জামাই আপ্যায়ন। ফলমুল, ভাত, গোস্ত, মাছ, তরকারী রুটি বিস্কুট চা এর যেন বন্যা বয়ে গেল। খেয়ে শেষ করা যায়না। তবু যেন ওদের আপ্যায়ন করে তৃপ্তি হয়না। হায়রে! মেহমানদারিতে

এরা কোথায় আর আমরা কোথায়। তবে এখানে মাছির উপদ্রব এত বেশি যে প্রথমদিন সকালে নাস্তা করতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। মাছিতে খাবারের প্লেট ঢেকে ফেলে। মাছিদের এটা ব্রিডিং টাইম। এদের দেশে এটা বসন্তকাল। মাছির অত্যাচারে বসে থাকাও মুশকিল। বাধ্য হয়ে দুপুরে মশারি টাঙ্গিয়ে তার নিচে খাওয়া দাওয়া করতে হল। মশার ভয়ে মশারি টাঙ্গাতে হয়। কিন্তু এখানে মাছির ভয়ে মশারি টাঙ্গাতে হল জন্য আমরা মশারীর নাম দিলাম মাছিরি।

এখানেও মানুষের বয়ানে বসা ও কথা শোনায় কোন আপত্তি নাই। নামায শেষে ছোট বড় প্রায় সবাই বসে পড়ে বয়ান শুনতে। আমাদের মধ্যে একজন বাংলায় বয়ান করেন, আর আমির সাহেব তার তরজমা করেন আরবীতে। ছোটরাও বসে থেকে চুপচাপ শোনে ও অন্য সময়ও এসে বসে বসে কথা শোনে অথবা কোরআন তেলাওয়াত করে। মানুষগুলো একদম সরল। সাজ পোষাকের কোন গুরুত্ব নাই। অথচ প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই কমপক্ষে একটা মোটর গাড়ী অথবা নিতান্ত কম হলেও দুই একটা মোটর সাইকেল আছেই। এরা সারাদিন প্রয়োজনে গাড়ী ও মোটর সাইকেল ভাড়া খাটায়। শহরের পথে প্রচুর মাইক্রো চলে। মাইক্রোগুলিতে প্যাসেঞ্জার উঠায়। মোটর সাইকেলগুলো রিক্সার মতো পেছনে প্যাসেঞ্জার টানে। শহর থেকে শহরে অথবা পাড়া থেকে পাড়ার যে দূরত্ব তাতে এর কোন বিকল্প আছে বলেও মনে হয় না। মরু এলাকার জন্য চারিদিকে ধু ধু মরুভূমি। মাঝে মধ্যে দুই/একটা গাছ অথবা ফাঁকা ফাঁকা ক্ষেত। এক বাড়ী থেকে অপর বাড়ী বালুর পাথার ভেঙ্গে যেতে হয়। এ যেন বালুর সমুদ্র। এখানে বেসরকারি বিদ্যুৎ আছে তবে পাওয়ার সাপ্লাই এর নিয়মটা অন্য রকম। ঠিক বিকাল পাঁচটায় পাওয়ার সাপ্লাই শুরু হয় এবং রাত তিনটায় বন্ধ হয়। এক সুইচেই অনেক গুলো লাইট ও ফ্যান জ্বলে ও বন্ধ হয়। ফলে গরমের কারণে ফ্যান দিয়ে রাখতে হয় অথচ লাইট বন্ধ করার সুযোগ নাই জন্য সবগুলো লাইটও জ্বালিয়ে রাখতে হয়। প্রথম ভোরেই ফজরের নামাযের পর বয়ান, তারপর ইশরাক এর নামায শেষে কোরআন শরীফ পড়ছি, হঠাৎ আমির সাহেব ডাকলেন, স্যার আসেন তো দেখি কি ব্যাপার। জানালা দিয়ে দেখলাম একটা মোটর সাইকেলে একজন বসে আছে এবং তার চারদিকে দশ/পনর জন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। বাইরে যেয়ে দেখি একটা মোটর সাইকেলের দুই ধারে দুইটা মাঝারী সাইজের পানির কন্টেইনারের একদিক কেটে তার মধ্যে বরফ দিয়ে সামুদ্রিক মাছ রাখা আছে। সবাই ঐ মাছ কিনছে। ছয়/সাত ইঞ্চি করে একেকটা মাছ লম্বা। নাম 'বাগ'। প্রত্যেকটা বিশ রিয়েল (প্রায় সাত টাকা) তবে দর দস্তর ও মাপামাপি নাই। যার যতটা দরকার নিয়ে নিচ্ছে। প্রথমে মাছটা একটা টিনের উপর রেখে চাকু দিয়ে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত টানা লম্বা করে ফেড়ে ফেলা হচ্ছে। হাত দিয়ে এখন নাড়ি ভুড়ি বের করা সহজ। আঁশ আছে, দেখতে কিছুটা

ইলিশ মাছের মতো। সকালের নাস্তায়ই মাছটি ভাজা হয়ে চলে এল। দেখলাম মাছের মধ্যের কাঁটা খুব মোটা ও শক্ত। আঁশ কিছুটা তুলেছে কিন্তু সবটুক নয়। বেলা হতেই দেখলাম, মোটর সাইকেলে করেই বিভিন্ন ফলমূল তরকারী আসছে। কিছুক্ষণ বিক্রী করে সাইকেল নিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এমন কি আইসক্রিমও এভাবেই বিক্রী হচ্ছে। স্থায়ী দোকানও আছে। সেখানেও প্রচুর বিক্রী হচ্ছে। যোহরের আযান ১২:২০ নামায ১২:৪০। লোকজন প্রচুর তবে মাঝ বয়সীদের সংখ্যা খুব কম, দুই/এক জনকে দেখলাম। শুনলাম এরা চাকুরীর সুবাদে সাউদি আরবে থাকে, কেউ কেউ অল্প সল্প বাংলা জানে। বলল, ওদেশে প্রচুর বাঙ্গালী আছে। ৩:২০ মিঃ এ আছরের আযান ৩:৪০ এ জামাত। আমাদের মনে আশঙ্কা হল আছরের ওয়াক্ত হচ্ছে তো? আমাদের সময় অনুযায়ী নামায হচ্ছে তো?

সালাম ফিরিয়েই গাশ্তের আদব বলা শুরু হল। একজন বাংলায় এবং মওলানা অনুবাদ করলেন। এলান দিতে হল না– কারণ এলাকার সাথীরাই বড় করে এলান দিয়ে দিলেন– অনেকটা ছোট বয়ানের মতো। এখন গেলে কাউকে বাড়ীতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং নিয়ম হল এখন চা খাওয়া ও উপস্থিত লোকদের সঙ্গে কথা বলা। প্রায় পাঁচটার দিকে গাশ্তে গেলাম। এদেশে বিদেশী জামাত আসে পাকিস্তান থেকে সবচেয়ে বেশি। তাই আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বোঝানোর জন্য আগেই মাশোয়ারায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আমরা প্রথমেই আমাদের পরিচয় দেব এ বলে "নাহ্নু ছিত্তানফর মিন বাংলাদেশ। তারপর দাওয়াত দেব। সেভাবেই শুরু করা হল। সুন্দর সাড়া পেলাম। এদেশে লোকজনকে ডাকলে বেশ কথা শোনে, শেষে বলি মুসতায়িদ্দুন? আসবে তো? প্রস্তুত তো? সবাই হৈ হৈ করে বলে আনা মুসতায়িদ্দিন। যে এলাকায় আমরা গাশ্ত করলাম এর পাশেই ধু ধু মরু প্রান্তর। দূরে ফাঁকা ফাঁকা জোয়ারের ক্ষেত। মাঝে মাঝেই সবুজ বরবটীর ঝোপ। এখানে বরবটির গাছ লতানো হয় না বরং অনেকটা ঝোপের মতো। বরবটির সাইজ চার/পাঁচ ইঞ্চি। ডিপ-টিউব অয়েল আছে। বাড়ীতে ট্যাপের লাইনে পানি সরবরাহ করে, গাধার পিঠের কন্টেনারে পানি দেয় আবার ক্ষেতেও পানি সেচ দেয়। প্রত্যেক বাড়ীতেই কম পক্ষে একটা নিম গাছ, বাবলা গাছ, কাঠবাদাম গাছ অথবা যে কোন ধরণের গাছ আছেই। যেখানে সেখানে যে গাছই জন্মাক ওরা সে গাছকে বাড়তে দেয়। কোন কোন বাড়ীতে করবীসহ দুই/একটা ফুল গাছও আছে। তবে সংখ্যায় কম। হেনা অর্থাৎ মেহেদী দেখলাম না। প্রতিটি গাছে নিয়মিত পানি দেয় এবং প্রচুর যত্ন করে। অনেকটা ছোট বাচ্চার মতো। যাদের গাছ বেশি তারা এ জন্য গর্বিত।

আমাদের জামাতের এটা তিন নম্বর মসজিদ। একশত বিশ দিনে কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ/পঞ্চাশটা মসজিদে যাওয়ার সুযোগ হবে। দেখি কোথায় কেমন কাটে। এ পর্যন্ত যা দেখলাম তাতে মানুষজনদের আচরণ এতই সরল ও আন্তরিক

লাগছে যে, ওদের সঙ্গে আমাদের আচরণের কথা মনে হলে লজ্জাই লাগছে। আমরা খেদমতের দায়িত্ব নিলে হিসাব করি অল্প টাকার মধ্যেই কিভাবে দায়িত্ব শেষ করা যায়। এখানে মেহমানদারি করে যেন ওদের মন ভরেনা। শুধু যে মেহমানরা খাচ্ছে তা কিন্তু না। মসজিদে যারাই ঐ সময় উপস্থিত থাকছে সবাই অংশ নিচ্ছে। এমনকি গরীব লোক- মানুষের সাহায্য চেয়ে বিশ্রামের জন্য মসজিদে এসে পড়ল, সেও ব্যাগ রেখেই বসে যাবে মেহমানের মতই এবং যে কোন থালাতেই তাকে স্বাগত জানানো হয়- কোন সংকোচ, দ্বিধা ছাড়াই। এদেশের মানুষদের গায়ের রং ও চেহারা অনেকটাই আমাদের দেশের মতো। টকটকে ফর্সা মানুষ প্রায় চোখেই পড়ে না। শ্যামবর্ণ ৮০% কিছু কুচকুচে কালও আছে। এমন কি আমরাই কেউ কেউ এখানে ফর্সা। ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে কিছু ফর্সা মেয়ে দেখলাম। মনে হয় মেয়েরা ফর্সা হতে পারে। তবে ছয়/সাত বছরের মেয়েরাও সবাই কাল বোরখা পড়ে। কিন্তু এসব বাচ্চাদের হাত মুখ খোলা থাকে। এখন থেকেই পায়ে মোজা পড়ে। এখানে এই চৌদ্দ দিনে এ পর্যন্ত একটাও কাল ছাড়া অন্য রং এর বোরখা চোখে পড়েনি এবং কোন বোরখাই চটকদার বা ডেকোরেটেড না। সানা বা হুদাইদাতে স্কুল কলেজের মেয়েদের এমনকি হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদেরও দেখেছি একই রকম বোরখা ও হাত-পায়ে মোজা। শুধু হাসপাতালে ডাক্তার মেয়েদের মুখে নেকাব খোলা- অথচ খুবই শালীন। কথা বলে বাতাসের সুরের মতো হালকা স্বরে- আস্তে আস্তে।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে পুরুষদের পোষাকের বর্ণনা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। প্রতিটি মানুষই- তা ছোট হোক বা বড়, খুব নক্সাদার সেলাই ছাড়া লুঙ্গি পড়ে, হজ্জের এহরাম বাঁধার সময় যেভাবে লুঙ্গি পড়তে হয়। এরা লুঙ্গির মাজা ভাজ করে একটা চওড়া নক্সাদার ও অধিকাংশ সময়ই দামী একটা বেল্ট পড়ে। সামনের দিকে বেল্টের সঙ্গে একটা খাপসহ খঞ্জর থাকেই। জন্মের পর পরই ছেলেদের জন্য খঞ্জর কেনা হয় এবং খুবই মর্যাদার প্রতীক খাপসহ খঞ্জর তারা সারা জীবন বহন করে। খাপের মাথাটা বাকানো এবং কোন কোন খঞ্জরের খাপের দাম শুনে আমি অবাক হয়েছি। একজনের বেল্টের সঙ্গে একটা নক্সাদার খাপ দেখলাম যার দাম ৪,০০০/-(চার হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল (১,৪০০/-/১,৫০০/ (এক হাজার চারশত/এক হাজার পাঁচশত) বেল্ট ও খঞ্জরের দাম সহ ৮,০০০/-(আট হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল। শুনলাম লক্ষাধিক টাকার সেটও আছে। হয়ত এই খঞ্জর কোনদিনই কোন কাজে আসবে না- তবু তাদের কাছে এটা দারুন মর্যাদার প্রতীক এবং গর্বের বস্তু। লম্বা ঝুলের জামা বা জোব্বা খুব কম। প্রায় লোকই লুঙ্গির উপর ফুলসার্ট এবং তার উপর কোট গায়ে দিয়ে থাকে। হুদাইদার গরমের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম দেখলাম না। তবে তবলীগের সাথীদের মধ্যে পূর্বের মতই জোব্বা বা সুন্নতী পোষাক ঠিকই চালু আছে এবং

ইদানিং মাদ্রাসাগুলিতেও সুন্নতী পোষাকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ফুলপ্যান্ট ও সালোয়ার কামিজ চালু। দামী পোষাকও এরা সাধারণভাবেই পড়ে এবং বসার সময় বালুর উপরই নির্দ্ধিধায় বসে পড়ে। অবশ্য বালুর সুবিধা এই যে, উঠে ঝাড়া দিলেই সব পরিষ্কার। ফলে কাপড় নোংরা হয় না আমাদের মতো, তবু বালু তো! মন যেন কেমন কেমন করে। তবে একটা জিনিস ভাল লাগছে, এদিকে মাছি বেশ কমে গেছে। খাওয়ার সময় বেশি অসুবিধা হচ্ছে না। মাছিরির প্রয়োজন পড়ে না। এদের প্রধান খাদ্য যোরা আমাদের দেশের জোয়ারীর এদেশী সংস্করণ। ভুট্টা গাছের মতই তরতাজা মোটা গাছের মাথায় একথোকা জোনার, বা যোরা। কাঁচা অবস্থায় অর্থাৎ প্রথমে সবুজ পরে পাকলে হালকা বেগুনি রং ধারণ করে। গাছসহ ফসল জাগ দিয়ে তারপর মারাই করে যাঁতায় পিষে ময়দা করতে হয়। সেই ময়দা বাড়ীর তন্দুরের মধ্যে ছেঁকে রুটি ও পিঠা বানায়।

৮:৩০ মিঃ এর মধ্যে খাওয়ার পাঠ শেষ। তার কিছু পরেই শোয়ার আয়োজন এবং ঘুমের আমল। যে কোন কারণেই হোক হঠাৎ করে ১২:৫০ মিঃ ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বাইরে গেলাম, চারিদিকে নিঃশব্দ নিঝুম পরিবেশ, চাঁদ দেখলাম না কিন্তু আলোর অভাব নাই। কিছুক্ষণ পরে চোখে মুখে স্নিগ্ধ বাতাসের প্রলেপ মাখিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে এসে বিছানায় যাব, মনে হল ভাই শফিউল ইসলাম জেগে আছেন। কাছে গেলাম। সত্যিই জেগে আছেন, কি কারণে যেন ঘুম আসছে না তার। মশারীর পাশে বসে বসে কথা বলতে ভালই লাগছিল। উনিও উঠে বসলেন কথা বলে মনে হল আরাম পাচ্ছেন। আসলে রাতের গভীরে মানুষের মনের দরজা খুলে যায়। ভেতরের গোপন মানুষ অর্গল খোলা পেয়ে মুক্ত-বাতাসের লোভে ক্ষুধাতুরের মতো বেড়িয়ে আসে। সে এক বিচিত্র জগৎ। এখানে সে প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা না করাই ভাল। এক অর্গলের বন্দি অন্য অর্গলে নূতন ঠিকানায় না হয় লুকিয়েই থাক। ক্ষতি কি? প্রায় তিনটা বাজে, উঠে পড়লাম। তিনটায় লাইট অফ হবে। সুতরাং হারিকেন ধরানোর প্রস্তুতি নিলাম। ফজরের নামাযের আগেই চা এল। সাতটার পর পরই নাস্তা। আজকে নাস্তায় নতুন জিনিষ যোগ হয়েছে যোরার রুটি। বেশ পুরু ও হালকা বেগুনি। বড় সাইজের চিতাই পিঠার মত সাইজ কিন্তু আগা গোড়াই পুরু। খেতে মন্দ লাগল না। তবে খেয়ে অভ্যস্ত নয় বলে বাড়ীতে বানানো তন্দুরের রুটি ও লম্বা রুটিই সাথীরা বেশি খেলেন। দুপুরে পোলাও ও মুরগী গোস্তের সঙ্গে ভেজিটেবল, মূলতঃ টমেটুর সঙ্গে সামান্য আলু। দুইটার মধ্যে খানা শেষ। কিন্তু তিনটা কুড়িতে আসরের আযান, তাই তালিম শুরু করা হল।

বিকেলে গাস্তে বের হলাম। শেষের দিকে প্রাচীর ঘেড়া এক বড় বাড়ীর ভেতরে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন রাহবার (এ দেশে বলে 'দলিল')। ঘরের মধ্যে

আটটা দড়ির খাটলা (খাটিয়া তবে মাজা সমান উঁচু)। প্রত্যেকটার উপর দুই/তিনটা বালিশ এবং কেউ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকে আবার কেউ হেলান দিয়ে বসে ঐ সবুজ পাতা (কাদ) দিয়ে গালটাকে টেনিস বলের মতো উঁচিয়ে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে। আমরা ভেতরে যেতেই একটা অদ্ভুৎ অবস্থার সৃষ্টি হল। চমকে উঠে একেবারে থতমত অবস্থা। হায়রে নেশার ছোবল! মাছুম বাচ্চার মতো অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। রাহবার সবার সাথে হাত মেলালেন এবং কুশল বিনিময় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার ঘরে আগুন লেগে যাওয়ার মতো হল। সবাই উঠে এসে একসঙ্গেই 'কাইফাল হাল' বলে বলে হাত মিলাতে এবং হাতে অথবা কাধে চুমু দিতে লাগল। এখানে দেখলাম 'কাইফা হালুকা' পাল্টে 'কাইফাল হাল' হয়ে গেছে। এরকম পরিবর্তন আরো অনেক কিছুতেই দেখলাম। সবচেয়ে কষ্ট লাগল, বিত্তশালীরাই নিজেদের ঘরের মধ্যে কাদের নেশা বিস্তারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অথচ নিষেধ করার বা বাধা দেওয়ার কেউ নাই। তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলাম ও কষ্ট লেগেছিল যখন হুদাইদা থেকে এজতেমার মাঠে আসার সময় চৌকি রক্ষীরা আমাদের গাড়ীসহ সব গাড়ী ও যাত্রীদের চেক করছিল। তখন ওদের গালকেও টেনিস বলের মত উঁচু দেখেছি।

প্রথম দিন মহব্বত, দ্বিতীয় দিনে তাশকিল এবং শেষ দিনে উসুল। তাই বাদ মাগরিব বয়ানের পর তাশকিল করা হল। তের জন সফরের জন্য নাম লিখাল। এর মধ্যে যে ছয় জন বিদেশে সফরের জন্য নাম লিখাল তাদের ভেতরে ভাই আব্দুল্লাহ আলী হাসানের ছোট দুই ভাইও আছে। সবাই খুব আগ্রহ দেখাল। এরাদা নয় বরং ওয়াদা করল। পরের দিনও হাসান ভাই একাই তার বাড়ীতেই খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন– অন্য কাউকে সুযোগ দিলেন না, আমাদেরকে রান্না করতে দেওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। চা এবং নাস্তার সময় নতুন এক পিঠা এল। প্রায় ছেলা বড় নারকেলের সাইজের একেকটা পিঠা দেখতে আমাদের গ্রামাঞ্চলের মুঠা পিঠার মতো অথচ ভেতরটা নরম। তরকারী, মধু অথবা দই দিয়ে খেতে হয়। আমি তরকারী দিয়ে খেলাম। ভালই লাগল।

তৃতীয় দিন মাশোয়ারা করে হাসান ভাই ও সাথীরা আমাদের রোখ "দ্বির আব্দুল্লাহতে" ঠিক করলেন। এখান থেকে মরু মাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার। আজকে দুপুরের খাদ্য তালিকায় একটা নূতন তরকারী এল। শুধু বরবটি গোটা গোটা রান্না করেছে। মনে হল হালকা একটু লবন ও পানি দিয়ে সিদ্ধ করে পরে অল্প একটু তেল দিয়ে মাখানো। অনেকটা মোটা সবুজ রং এর নুডুলস এর মতো। যে সমস্ত সাথী বিদেশে যেতে চেয়েছিলেন তাদেরকে পাসপোর্ট করার জন্য দরখাস্ত করতে বলা হল। ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) রিয়েলসহ ফরম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের হালকার জিম্মাদারের কাছে জমা

দিতে অনুরোধ করা হল। আজ বাংলাদেশে ইজতেমা শুরু হয়েছে। অথচ আমরা কত দূরে। অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে রাত্রে টুঙ্গি ইজতেমার জন্য দোওয়া করা হল।

আজ শুক্রবার ৩১/০১/০৯। টঙ্গিতে আজকে তো মানুষের সমুদ্র। অথচ এবার আমরা কত দূরে। বারবার ঘুরে ফিরে সবার মুখে ঐ কথা। নাস্তার পর অন্য মসজিদে যেতে হবে। সুতরাং আটটার মধ্যেই সব রেডি। গাড়ী এল, মাল সামানা তোলা হল। হাসান ভাই রাজ মিস্ত্রীর কাজ করেন, দৈনিক মজুরী ৩,০০০/-(তিন হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল। বাড়ীর অবস্থা অসম্ভব ভাল। প্রায় তিনশত/তিনশত পঞ্চাশ বিঘা জমির মালিক। প্রত্যেকদিন তিন ঘন্টা একটা বিরাট মটর থেকে পানি তুলে এলাকাবাসীকে ফ্রি ব্যবহার করতে দেন। তিনশত ফিট নিচে থেকে পানি উঠে। দৈনিক তিনশত টাকার মত এতে খরচ হয়। ফি সাবিলিল্লাহ। এবারও তার ভাইয়ের গাড়ী। তিনি মটর সাইকেলে নিজের কাজে চলে গেলেন। বলে গেলেন, ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকদিন বিকালে আমাদের কাছে যাবেন এবং এশা পর্যন্ত থাকবেন। সত্যিই তিনি কথা রেখেছিলেন।

মরুর ধুলা উড়িয়ে আমরা রওয়ানা হলাম। পথের মোড়ে একটা খুব পুরাতন বাংলা ইটের ভাঙ্গা দালান দেখা গেল। ইটগুলো ৮-১০ ইঞ্চি মনে হয়। বর্তমান কালের দোতলার চেয়েও উঁচা একদিকের দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সম্ভবত দূর্গ ছিল। পরে শুনলাম যে এর পাশেই কানাবেজ এর মার্কাজ। মসজিদ সংলগ্ন খুব পুরাতন একটা কবর টম্ব এর মতো করা আছে। নাম 'হাফি আল হিমা'। ভেতরে ঢোকার দরজা পর্যন্ত আছে। শুনলাম আসহাবে কাহাফের সেই সম্রাট দেক ইয়ানুস আমলের তৈরী এই সমাধি সৌধ। আর তুর্কি কালাহ বংশধরেরা বিল্ডিংটি নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাসে দ্বির আব্দুল্লাহর উল্লেখ আছে। এ গ্রামটিও পাথরের ব্লকের তৈরি। তবে বিভিন্ন জায়গাতে তিন/চারটা পুরাতন বাংলা ইটের সঙ্গে পাথরের ব্লক দিয়ে আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা বাড়ীও দেখা গেল, সব গুলো দালানই বেশ উঁচা, বর্তমান দালানগুলোর চেয়ে তিন/চার হাত উঁচু কমপক্ষে। একটু সামনে যেতেই মসজিদের দেখা পেলাম। অনেক বড় মসজিদ। বারান্দাতে ভাই মোহাম্মাদ আলী বুন ও দুই/তিন জন সাথী দাঁড়িয়ে আছেন। জুমার দিন, পুরা মসজিদ সাফাই করা হচ্ছে। ভাই মোহাম্মদ আলী বুন সহ বেশ কিছু সাথী গতকাল মসজিদে নাজ্জারিয়ায় আমাদের মাশোয়ারায় গিয়েছিলেন। উপহার হিসাবে আসা ছয়/সাতটা তরমুজ, তিন/চারটা বাঙ্গী, পাঁচ/ছয়টা মাল্টা, খেজুর তো ছিলই তার সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশ থেকে সঙ্গে নেওয়া বড় একটিন বিস্কুট প্রায় গোটাই ছিল। তার থেকে শুধু গতকাল সন্ধ্যায় বয়ানের পর এক কেজি পরিমান বিস্কুট মেহমানদারীতে দেওয়া হয়েছিল। ফলে বেশ ভাল ভাবেই মেহমানদারী করা হয়েছিল। গাড়ী থেকে নেমে আমরা মাল সামানা ঘরে তুলছি। উনি খাদেমকে বলে দিয়েছেন আমাদের গ্যাসের চুলা

ষ্টোর রুমে তুলে রাখতে। আমরা যখন চুলার খোঁজ করছি, উনি হেসে বললেন, চুলা আমাদের কাছেই রাখা হয়েছে। আপনারা চিন্তা করবেন না। আর আমির সাহেব কে বললেন, এ তিনদিন আপনারা আমার মেহমান। কথা শেষ হওয়ার আগেই কয়েক প্যাকেট বিস্কুট ও দুই ফ্লাক্স চা এসে হাজির। একটায় শায়ে দাউদী বা দুধ চা ও অন্যটাতে শায়ে সোলেমানি বা লাল (র) চা। সবাই বসে গেলাম। এখানে দুধ এত ভাল লাগে যে আমিও নিয়মিত দুধ চা খাই। ঘন দুধের মধ্যে হালকা চায়ের লিকার– মিষ্টি কম। বেশ ভাল লাগে।

মাশোয়ারা হল নূতন মসজিদের হক, তাই আমরা দিনের নিজাম করতে বসলাম। একটু পরই ছয়টা কোল্ড ড্রিংক এসে হাজির। ভাই নিজের হাতে নিয়ে এসেছেন। কোন ক্রমেই না খাইয়ে ছাড়লেন না। পরে জানলাম, তিনি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক ও আফ্রিকার একটা দেশে (সম্ভবত জিবুতি) সফর করেছেন। ছোটখাট হাসিখুসি মানুষ। সব দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বড় দোকান আছে বাড়ীর সঙ্গে। খড়ির ব্যবসাও আছে। অনেক জমি-জমা ও বিরাট বাড়ী। দুপুরে জুমা শেষে উনার বাড়ীতে গেলাম। অনেকগুলো দালানের সাথে অনেকটা খরের পালার মতো মাথা উঁচু ও গোল মতো ঘরে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা। প্রায় বাড়ীতেই এ ধরনের একটা করে ঘর দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম রান্নাঘর। এখন দেখলাম এগুলো বিশেষ ধরনের ঘর। কাঁটা জতীয় গুল্ম দিয়ে ছাওয়া এইসব ঘরের ভেতরে পুরু করে এঁটেল মাটি দিয়ে প্রলেপ দেয়া। শুকানোর পরে তার উপর সম্ভবত আলকাতরা বা কাল রং দিয়ে আঁকিবুকি এঁকেছে। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতির একটা স্পষ্ট ছাপ বলে মনে হল। সাগরের ওপারেই আফ্রিকা। সুতরাং এটা মনে হয় সেই পুরানো কালের আফ্রিকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জের। তবে কালচার যাই হোক ঘরের ভেতরটা বেশ ঠান্ডা এবং আরামদায়ক। এখন এখানের তাপমাত্রা ২৫° ডিগ্রীর কিছু কমবেশী হতে পারে। শুনলাম গরমে এই তাপমাত্রা ৪৯° ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। তখন বাইরে বের হওয়াই যায়না। সে সময় এ ঘরগুলো বেশ কাজে আসে।

যথারীতি খাওয়ার আয়োজন প্রচুর। আজকের দস্তরখানে দুইটা অপ্রত্যাশিত আইটেম দেখলাম। নুডুলস এবং মুরগীর সুপ। গোটা মুরগী সুপ করার পর পৃথকভাবে ঐ সুপের মুরগী রান্না করা মুরগীর মাংসের সঙ্গে প্লেটের এক পাশে পৃথকভাবে দিয়ে দিয়েছে। সালাদের শশা, টমেটু, গাজর কুচির সঙ্গে একগাদা সবুজ পাতা। পরে খেয়ে বুঝলাম মুলার কচি পাতা। খেতে ভালই লাগল। এ দেশী মুলার পাতায়ও কোন গন্ধ নাই এবং বেশ নরম। আমি নুডুলসই বেশি খেলাম। বড় এক বাটি সুপও খেলাম। এর পরে একটা সুন্দর নক্সাদার কাঠের ঘরের বারান্দায় চা পানের ব্যবস্থা। দরজায় কাঠের সুদৃশ্য নকশা দেখছি, মুন ভাই ঘরের দরজা ঠেলে খুলে দিলেন। বেশ বড় পাকা ঘর। ভেতরের চার দিকের

দেওয়ালই প্রচুর ব্যবহারিক জিনিষ দিয়ে সাজানো। আগাগোড়া বেশ কয়েকটি তাক করে ঘরটি বানানো। চিনেমাটির বাটি, গ্লাস, ফ্লাক্স, ফুলদানী, আয়না, এলোমিনিয়ামের বড় থালা এ রকম বহু কিছু দিয়ে ঘর সাজানো। নিচের চারদিকে দেওয়াল সংলগ্ন মেঝে ছয় ইঞ্চি উঁচা করে গাঁথা যার উপর আটটা খাটলা বালিস দিয়ে সাজানো। আমাদের রুচিতে হয়ত এ ধরনের গৃহস্থালি জিনিষ দিয়ে সাজানো প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে কিন্তু তাদের চোখে এটা অবশ্যই সুন্দর এবং রুচিশীলও বটে। খাটলায় বসে আরেক দফা চা খাওয়া হল। সঙ্গে মালটা ও তরমুজ। তারপর মসজিদে ফিরে আসছি এ সময় হঠাৎ মাথার উপরে কয়েকটা পটকা ফুটলো। আমাদের দেশে বাঁশের চলটার সঙ্গে বেঁধে হাওয়াই পটকা উপরে উঠিয়ে ফাটানো হয়। এখানে সে রকম না। কেমন করে যেন উপরে উঠে ফেটে যাচ্ছে এবং কয়েক রং এর ছোট ছোট হালকা আলোর ফুলকি দেখা যাচ্ছে। প্রাচীরের ভেতরে জন্য কিছু দেখা গেল না। স্থানীয় সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই ব্যাপার কি? উনি জানালেন ঐ বাড়ীতে আজকে বিয়ে হচ্ছে। নামাযের পরে বেশ কিছু মহিলা মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে পাশের ঐ বাড়িটাতে ঢুকলেন- পরে বের হয়েও এলেন। প্রাচীরের এপার থেকে আমরা কোন রকম হৈ চৈ তো দূরের কথা কোন কথাও শুনতে পেলাম না। না বললে বুঝতেও পারতাম না ঐ বাড়ীতে বিয়ের মতো সামাজিক একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে বোঝা মুশকিল। তবে বরযাত্রী আসলে যে রকম বিশৃঙ্খলা হয় সে রকম কিছু হল না জন্য ধরে নিলাম ছেলেই বোধ হয় বিয়ে করতে গেল। অথবা বিয়ে করে ফিরে এল। রাত প্রায় তিনটার দিকে উঠে দেখলাম সাত/আটটা গাড়ী মসজিদের চারদিকে পার্ক করে রাখা হয়েছে। ফজরের নামাযের পর কয়েকটা গাড়ী চলে গেল। এই মসজিদটি অনেক পুরাতন। প্রায় পোনে তিন হাত চওড়া দেওয়াল। মাথার উপরে পুরানো আমলের দুইটা গোলাকার ঘোরানো গম্বুজ। একই নিয়মে চতুস্কোন দেওয়ালকে চারদিক থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট করে এনে গোল করা হয়েছে। সঙ্গে লাগোয়া অজুর ঘরের কিছু অংশ ভাঙ্গা। সেখানে প্রাচীন বাংলা ইট দাঁত বের করে আছে। দেওয়াল ইটের না পাথরের তা উপরের পলেস্তরার জন্য দেখা গেল না। তার সঙ্গে কংক্রিটের পিলার যোগ দিয়ে মসজিদকে অনেক বড় করা হয়েছে। পাশে আরো একটা ঘর ডানদিকে পেছনে বানানো হয়েছে। জুমার নামাযে তো মনে হল দুই তিন শত মানুষ নামায পড়ল।

ঐ রাত্রে যে ঘটনা ঘটল তাতে বেশ ভয় পেলাম। প্রায় তিনটার কিছু পরে অজু করে ঘরে ঢুকছি, দেখি সাইফুল ভাই অন্ধের মতো হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ঘরের মধ্য থেকে বাইরে যাবার রাস্তা খুঁজছেন। হাতের হারিকেন এগিয়ে দিলাম। তিনি না- না করে উঠলেন। চোখে আলো পড়লে দেখতে সমস্যা হয়।

সাইফুল ভাই এর চোখের সমস্যা আছে তা জানতাম, কিন্তু তা যে এত বেশি সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলাম। বললেন, আজকে প্রথম রাত তো, পরে সব কিছু মুখস্ত করে নেব, তখন আর অসুবিধা হবে না। তিনি হাফিজ ভাই হিসাবে বেশি পরিচিত। আমরা সমবয়সী, তিনি এককালে ভালো ফুটবল খেলতেন। পাকিস্তান-এর যুদ্ধকালীন সময়ে করাচীর বন্দি শিবিরে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছেন। খুবই ভাল মানুষ। তাকে নিয়ে অনেক সময়ই হাসি ঠাট্টা করা হয়। কিন্তু তিনি যে এত অসহায় তা কাউকে বুঝতেও দেননি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আল্লাহ পাক তো আমাকেও এ রকম অসহায় করে দিতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে কি আমি এত মুজাহাদা করে এ রকম একটা কষ্টকর মুরুভূমির দেশে সফরে আসতে পারতাম? তার জন্য মনের ভেতর থেকে এমনিতেই দোয়া বেরিয়ে এল। হাফিজ ভাইয়ের চোখের মনির উপর লেন্স সেট করা আছে তারপরেও চোখে পাওয়ারের চশমা পড়েন। তাও এই অবস্থা। আল্লাহ তাকে সুস্থ্য হতে সাহায্য করুন। আমিন।

দ্বিতীয় দিনও আমাদের দৈনন্দিন এজতেমায়ী আমল স্বাভাবিক ভাবেই চলল। আজকেও গাস্তে যেয়ে বিরাট একটা রেলওয়ে স্টেশনের সমান ঘরে এক দল মানুষ পেলাম যারা কাদ খাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক লাগছে, যেদিন যেদিকেই গাস্তে যাচ্ছি কমপক্ষে একটা বড় বাড়ী বা ঘর পাওয়া যাচ্ছে যেখানে অসংকোচে বড়লোক মধ্যবিত্ত সকলেই কাদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। এত টাকা এরা পায় কোথায়? চলেই বা কি করে? এই দুই মসজিদেই বয়স্ক ও শিশুদের প্রচুর উপস্থিতি আছে। বুন ভাই জানালেন, ১২% রোজগার হয় জমি থেকে। বাঁকী রোজগারের জন্য লোকেরা কেউ গাড়ী ভাড়া খাটায় এবং বেশির ভাগই সৌদি আরবে চাকুরী করে। ওদের টাকায় এদেশে ওদের আত্মীয় স্বজনদের সংসার চলে। এ জন্যই সকালে, বরং বলা ভাল খুব ভোরে, কাল বোরখা ও তাল পাতার তৈরি একধরনের হ্যাট (আমাদের গ্রামের মাথ্যাইল এর মত) মাথায় দিয়ে মেয়েরা জমির দিকে যায় এবং মাগরেবের কিছু আগে কাঁধের ঝুড়িতে করে ফসল (?) নিয়ে ঘরে ফিরে। এই মরুসদৃশ গাছ পালাহীন বিরান ভূমিতে ওরা দুপুরে খায় কোথায় এবং পানি কোথায় পায়? কোন একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে যা আমি দেখিনি।

কাল সকালে অন্য মসজিদে যেতে হবে। রাতের মোজাকারা শেষে যে সামান্য গুছানোর কাজ ছিল তা শেষ করে মশারী টাঙ্গানোর যোগার করছি হঠাৎ করে দুপুরের খাওয়ার বিষয়টা প্রাসঙ্গিক গল্পের মধ্যে উঠে এল। দুপুরে আজ অন্য এক বাড়ীতে দাওয়াত ছিল। তিনি একটা দুম্বা যবেহ করেছিলেন। সঙ্গে আরো মেহমানও কিছু ছিল। মুরগীর সুপ ছাড়াও বোরহানীর মতো একবাটি সুরুয়া খেলাম। দুম্বার রান্না করা ভূড়িও খেলাম, তবে আমাদের দেশের মতো নয়

বরং অন্যরকম ভাবে। গোটা ভূড়িটার চিকন নারী উল্টিয়ে পরিস্কার করে কিছু মোটা ভুড়ির সঙ্গে দড়ি পেঁচানোর মতো পেঁচিয়ে সেটাকে আগুনে হালকা করে ভাজা হয়েছে। মরিচ এরা খায়না শুধু হালকা একটু নোনতা স্বাদ। এমনকি মচমচেও না। দুম্বার গন্ধ কিছুটা থেকেই গেছে। এই কথা থেকে প্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎ করেই মনির ভাইয়ের মোষ মেরে গ্রামবাসীকে খাওয়ানোর প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। আমরা অনেক ঠাট্টা করলাম। তিনি অন্য সময়ের মতো হাসি মুখেই শুনছিলেন। কি মনে হল, জানতে চাইলাম সত্যিকার কোন্ কারণে তিনি এ কাজ করেছিলেন। উত্তরে যা বললেন তা অবিশ্বাস্য।

১৯৯৯ সালে হজে যাওয়ার ঠিক আগে হঠাৎ করে তার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। মায়ের সেবা যত্ন সবকিছু মুনির ভাইকেই করতে হত। তিনি নিজেও সে সময় হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পাবনা ও ঢাকায় বহু ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করান। পাবনার এক ডাক্তার তাকে বলেছিলেন তার পেটের পিত্ত নালীতে পাথর হয়েছে সেজন্যই সবসময় ঢোলের মতো তার পেট ফুলে থাকে এবং স্বাভাবিক প্রস্রাব হয় না। বহুবার বিভিন্ন টেস্ট করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত রোগ কেউ ধরতে পারেনি। ২০০০ সালের প্রথম দিকে একরাতে তার অবস্থা এতই খারাপ হয় যে তিনি মারা যাচ্ছেন মনে করে বিভিন্ন মসজিদ ও মার্কাজে বিশেষ দোওয়া করা হয়। শেষ আশা মনে করে ঐ অবস্থায় ছেলে এ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে আবার ঢাকা বারডেমে নিয়ে যায়। যে কোন কারণেই হোক ভর্তি হতে খুব দেরী হচ্ছিল। ছেলে রাগ করে অন্য এক আত্মীয়ের পরামর্শে তাকে পপুলার হসপিটালে নিয়ে যান। সেখানের একজন ডাক্তার বুঝলেন যে, পাথর পিত্ত থলিতে নয় বরং পিত্ত থলির নাড়ীর মধ্যে হয়েছে। মুখের মধ্যে পাইপের মতো যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে তিনি নালীর মধ্য থেকে পিত্ত থলির পাথর ভেঙ্গে বের করে আনেন এবং মুনির ভাই ভাল হয়ে এক মাস পর বাড়ী ফিরে আসেন। কিন্তু এক বৎসর পর আবার তার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে এবং তিনি আবারও ঢাকায় যেয়ে পিত্ত পাথর ভাঙ্গিয়ে আনেন। কিন্তু তারপরও তার পেট প্রায় সব সময়ই ফুলে থাকত এবং দৈনিক একগাদা ঔষুধ খেতে হত। পেটের উপর কোন কাপড় রাখতে পারতেন না। পাবনা মার্কাজে আসাও অনিয়মিত এবং বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। খুবই সামান্য কিছু পাতলা খাবার অনেক মেনে বেছে খেতে হত। অসুখ শুরুর প্রথম দিকেই তিনি একদিন স্বপ্নে দুইটা মহিষ দেখেন। একটা আরেকটাকে বলছিল, আমাদের সাদকা করে দিলেই তিনি ভাল হয়ে যাবেন। এদিকে ইয়েমেনের সফর তখন সম্ভবতঃ আর হবেনা এমন পর্যায়ে চলে গেছে। সোয়াদ হবার প্রায় বছর ঘুরে আসছে। হঠাৎ তার ঐ স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। তিনি তখন এই সফরের জন্য গচ্ছিত টাকা দিয়ে একটা বড় দেখে মহিষ কিনে সাদকা করার এবং গ্রামের সাধারণ মানুষদের খাওয়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সবচেয়ে

অবাক ঘটনা ঘটে যখন মহিষটি জবাই করা হয়। তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে শুয়েছেন আর বাইরে মহিষ জবাই করার হৈ চৈ হচ্ছে। মহিষটা জবাই করার সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের মধ্যে খুব জোরে মোচর দিয়ে উঠল এবং প্রচন্ড শব্দে পেটের বাতাস বের হয়ে গেল। তারপর থেকে তিনি মোটামুটি সুস্থ।

আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে তার মুখে ঘটনার কথা শুনছিলাম। প্রথম যখন কাকরাইলে আসি তখন তার কাছে প্রচুর ঔষধ ছিল। পেটটা তখনও উঁচা এবং উপর পেটের উপরে লুঙ্গি ঢিলে করে পড়তেন। খেয়াল করে দেখলাম, পেট এখন প্রায় স্বাভাবিক এবং কিছুটা হালকাভাবে হলেও লুঙ্গি স্বাভাবিকভাবে পড়ে আছেন। অনেকদিন হল আমাদের সঙ্গে সব ধরনের খাবারই খাচ্ছেন। ব্যাগ খুলে ঔষধ বের করে দেখালেন। মনে পড়ল প্রথম প্রথম তাকে অনেক ঔষধ সত্যিই খেতে দেখেছি এবং ইদানিং কোন সময়ই তাকে ঔষধ খেতে দেখিনা কিন্তু তারপরও এটা রহস্য গল্প না ভৌতিক না আলৌকিক তা নিয়ে সংশয় কাটল না।

আমাদের এবারের গন্তব্য সামালী দ্বারে ফাহাম মসজিদ। সকালের নাস্তা শেষ করেই "দুর্গম গীরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" এর জন্য আমরা তৈরি। বাহনও এসে হাজির। সুতরাং মরুর ধুলা উড়িয়ে "কারাভাঁর" যাত্রা হল শুরু।

সামালিতে আমাদের মসজিদ এর সঙ্গেই একটা মরু টিলা। একটু বাতাস হলেই বালু এসে মসজিদ ভরিয়ে দেয়। সুতরাং ঐ দিকের জানালা প্রায় সময় বন্ধ রাখতে হয়। বালিয়ারী বলতে যা বোঝায় একদম সেই রকম। উঁচু নিচু বালুর বিস্তার। তার মধ্যে এখানে ওখানে মাঝে মধ্যে ছিটানো বাড়ীঘর– দুই একটা গাছ। স্থানীয় সাথী মোঃ ইয়াহ্‌হিয়া ভাই মসজিদেই ছিলেন। খুবই পরিশ্রমী ও কোরবানী করা সাথী, মাস্তুরাতসহ চিল্লাও দিয়েছেন। দিন রাত দুই ছেলেসহ আমাদের খেদমতে, খাওয়ারও ব্যবস্থা তার বাড়ীতেই। আমরা নিজেরা কোন ভাবেই তাদের নিবৃত্ত করতে পারলাম না। এলাকার পুরা জামাত একমত হয়ে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে এবং উনি সেই কাজ নিয়ে শ্রম দিচ্ছেন হাসিমুখে।

এর আগের দুটো গ্রামে পাখি প্রায় দেখিনি দুই একটা চড়ুই পাখি ছাড়া। এখানে কিছু পাখি দেখলাম। এমন কি বিভিন্ন রকম ঘুঘুও। প্রায় পঞ্চাশ/ষাট হাত দূরে চারটা গাধা বাঁধা। তার মধ্যে একটা মর্দা গাধা কিছুক্ষণ পরপরই ডেকে উঠছে। রাত্রেও বিরাম নাই। পিঠের উপর জিন (?) সবসময় দেওয়াই আছে। এখানে মুরুব্বীরা ছাড়া দশ পনরটি ছোটবড় ছেলে প্রায় সবসময়ই আমাদের সঙ্গ দিল। সুতরাং একটু পরপরই কেউ না কেউ এসে ভুল ইংরেজীতে আমার কাছে কিছু জানতে বা বলতে চাইত। সম্ভবতঃ ইংরেজী বলতে পারে সেই কৃতিত্ব প্রকাশের কসরত। যা হোক আব্দুল আজিজ বলে আরো একটা দশ/এগার বৎসরের ছেলে সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকে। ছয় পারার হাফেজ। এমনকি রাত্রেও বিছানা নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকল। মানুষের উপস্থিতি প্রতিটা বয়ানেই

নজর কাড়ার মতো। কিছুক্ষণ পরপর কেউ এসে জিয়ারা (গাস্ত) করার জন্য ডাকে। মসজিদের সামনেই একটা ল্যান্ড রোভার গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, মালিক ভদ্রলোক সৌদি আরবে চাকরী করেন নাম ইয়াছিন। প্রথম দিন তার কাছে কথা বলতে গিয়ে কোন পাত্তাই পেলাম না। তিনি এসব একদম পছন্দ করেন না এবং তার কোনই সময় নাই এ রকম বলে পত্র পাঠ বিদায় করলেন। বলতে ভুলে গেছি ইয়েমেনের সব মসজিদেই আযান, একামত ও নামায সবই মাইকে হয়। সুতরাং বাদ মাগরিব বয়ান অন্য মসজিদের মতো এখানেও মাইকেই হল। দ্বিতীয় দিনে তিনি বাদ মাগরিব কিছু সময় বয়ানে বসলেন। তৃতীয় দিনে বাদ এশা খুছুছি গাস্তে আবার তার কাছে গেলাম। কিছু কথা বললেন এবং বয়ান শুনেছেন তাও বললেন। সকালেও বসবেন বলে কথা দিলেন। সকালের যাত্রায় মোহাম্মদ আলী বুন ভাই তার গাড়ীতে আমাদের লিফট দেবেন কথা ছিল কিন্তু ইয়াছিন সাহেব আমাদের নাস্তার মধ্যেই এসে হাজির। তিনি আমাদের তার গাড়ীতে লিফট দিতে চান। আমির সাহেব জানিয়ে দিলেন আমাদের জন্য গাড়ী আসবে একটু পরেই। তিনি নাস্তা করতে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমির সাহেবের কথা শুনেই মত পাল্টিয়ে বললেন যে, নাস্তা তিনি ফিরে এসে করবেন কিন্তু তিনিই আমাদের লিফট দেবেন। এই বলে নিজেই গাড়ী গেটে এনে দাঁড় করালেন। স্থানীয় সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত এই গাড়ীতে যাওয়াই ঠিক করা হল। মাল সামানা তিনি নিজেই গাড়ীতে গুছিয়ে রাখলেন এবং আমাদের নিয়ে বালিয়ারীর মরু পথ পাড়ি দিতে লাগলেন। বেডফোর্ড ফোরহুইল ড্রাইভ বড় জীপ গাড়ী। মক্কা থেকে তার বাড়ি ১০০০ কি. মি. হলেও তিনি মাত্র দশ ঘন্টায় মক্কা থেকে বাড়ী আসেন। বিশেষ ধরনের চওড়া চাকার গাড়ী। বালুর মধ্যে এবং রাস্তায় জার্কিং হয় না। চাকা বালুতে দাবিয়ে এবং বিভিন্নভাবেই তিনি পথেই তার গাড়ীর কিছু তেলেসমাতি দেখালেন। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ী দশ বৎসর আগে ৯,০০,০০০/-(নয় লক্ষ) টাকায় কিনেছেন। দেখে এখনও নতুন বলে মনে হয়। কোথায়ও পুরাতনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত পড়েনি– এতই সুন্দর। সুযোগ পেলেই দাওয়াতের মেহনত-এ সময় লাগাবেন বলে কথা দিলেন এবং পরবর্তীতে বাড়ী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। পথ ছিল বেশ দীর্ঘ। বিভিন্ন গল্পের এক পর্যায়ে আমাদের ওমরা করার আকাঙ্খার কথা তিনি শুনলেন। নিজে থেকেই বললেন, আমাদের অনুমতি মিললে এবং যাওয়ার তারিখ জানালেই তিনি নিজে এসে আমাদেরকে ওমরা করতে নিয়ে যাবেন। মসজিদে পৌঁছে দিয়ে তারপর একসময় তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

ওখানে তাশকিলের সবচেয়ে মজার ঘটনার কথাও বলা মনে হয় প্রাসঙ্গিক হবে। বিকালে উমুমী গাস্তে যেয়ে দেখলাম, নিচের দিকে কিছুটা প্রায় সমভূমির মতো এলাকায় নূতন একটা আবাসিক এলাকা তৈরি হচ্ছে। প্রায় একশতবিশ

থেকে একশত ত্রিশটা বাড়ী হচ্ছে। মধ্যে চওড়া রাস্তা এবং দুই/একটা বাড়ীর পরেই সাইড রোড। অনেক বাড়ী তৈরি হয়ে গেছে। বেশিরভাগ বাড়ীই হচ্ছে পাথরের বোল্ডার ও বিভিন্ন সাইজের সিমেন্ট/পাথরের তৈরি ব্লক ইত্যাদি দিয়ে। কোন কোন ব্লক সিরামিক ইটের মতো মধ্যে ফাঁপা করে তৈরি করা। এর মধ্যে একটা বাড়ীতে কাদ খাওয়া চলছিল। আমরা ঐ বাড়ীতে গাস্ত শেষে ফেরার পথে শুনলাম এই এলাকায় এক ভদ্রলোক আছেন। তিনি ইংরেজি ভাল জানেন এবং বহুদিন লন্ডনে ছিলেন। কিন্তু বিকালে তাকে পাওয়া গেল না। এশার পরপরই আব্দুল আজিজ ও আব্দুর রহমান খবর আনল, ভদ্রলোক এসেছেন। সুতরাং খুছুছি গাস্তের উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে দেখা করব বলে ঠিক করলাম। ভদ্রলোকের নাম শুনলাম আহমদ। সঙ্গে আগে পিছে কি যেন আরো আছে, মনে নাই। তার বাড়ীর কাছে আসতেই দেখি তিনি গাড়ীতে চড়ে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। ষ্টিয়ারিং এ বসে থেকেই কিছুক্ষণ কথা বললেন। তবে তিনি কথা দিলেন দাওয়াতের মেহনতে সময় লাগাবেন সুযোগ পেলেই। অযথা সময় নষ্ট করার মানে হয় না। তার মন এখন কিছু শুনতে তেমন প্রস্তুত নয়। সুতরাং বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

রাত নয়টা বেজে গেছে। আমরা শোবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিল, আহমদ সাহেব অপেক্ষা করছেন। যদি আমার সময় হয় তবে উনি আমার সাথে কথা বলতে চান।

আমাদের অবস্থা, পাগল ভাত খাবি? না পাতা পাড়ব কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে দড়াদড়ি রেখে আমরা তিনজন লুঙ্গি পড়েই রওয়ানা হলাম। জিম্মাদার সাহেব সতর্ক হয়ে কথা বলতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু একি? তার বাড়ীতে যেয়ে দেখি দশ/বার জন খাটলায় শুয়ে বসে কাদ খাচ্ছে আর তিনি ফারসী হোঁকা টানছেন। কোলের সম্মুখে পলিথিনের প্যাকেটে এক গাদা কাদ এর ছোট ছোট ডালসহ পাতা। মনটা দমে গেল। এমনটা আশা করি নাই। আবার ভাবলাম, সবকিছু আমার মনের মতো হবে তাই বা আশা করি কিভাবে? যাহোক এক মুখ হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কাইফাল হাল? সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবাই উঠে এসে মোসাফাহা করা ও কুশল জিজ্ঞেস করা শুরু করল। আহমদ সাহেব আমাদের সসম্মানে বসিয়ে বললেন ওদের উদ্দেশে আমি যদি ইংরেজীতে বয়ান করি তবে তিনি তর্জমা করে ওদের কথাগুলি বুঝিয়ে বলবেন। তিনি দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন। গত বৎসরও বিশ দিন বোম্বে থেকে এসেছেন ব্যবসার কাজে। আমি সুযোগ পেয়ে বয়ান শেষে তশকিল শুরু করলাম। এক পর্যায়ে প্লেন ভাড়া, থাকা খাওয়া, হাত খরচ ও বিভিন্ন সম্ভাব্য খরচসহ খুটিনাটি অনেক প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে আসতে চাইলেন এবং সাথীদের নিজেই তাশকিল করলেন। দুই/তিন জন বেশ আগ্রহ দেখালেন এবং কোন সময় আবহাওয়া তাদের অনুকূল

হবে এবং কোথায় কিভাবে কি করতে হবে জিজ্ঞেস করে সবই শুনলেন। হঠাৎ করে প্রশ্ন করলেন, বাংলাদেশে কাদ কোথায় এবং কেমন পরিমান পাওয়া যায়? এমন প্রশ্নের সম্মুখিন হব তা ধারণার মধ্যে ছিলনা। তবু সত্যি কথা বললাম যে, বাংলাদেশে কাদ এখনও পাওয়া যায় না। শুনে উনারা যেন চুপসে গেলেন। বলেই বসলেন, কাদ না পাওয়া গেলে আমরা এতদিন থাকব কিভাবে। আসলে অভ্যাস বড় কঠিন জিনিষ। আমাদের সাথীদের মধ্যেও দুই সাথী পান জর্দায় আসক্ত। বাংলাদেশ থেকে যে পান তারা এনেছিলেন তার বেশির ভাগই হুদাইদার এজতেমায় যাওয়ার সময় ভাল করে পলিথিনে প্যাক করে সানা মার্কাজেই রেখে গিয়েছিলেন যেন গরমে নষ্ট না হয়। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন, সব পান একদমই পচে গলে গেছে। ফলে কানাবেজ এ আসার সময় তারা খুব চেষ্টা করলেন পান শুপারি সংগ্রহের। শেষ পর্যন্ত মোটর সাইকেলের এক চালক তথ্য দিল, অনেক দূরে এক জায়গায় পান পাওয়া যাবে। ঐ মোটর সাইকেল নিয়ে প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় তারা পান শুপারি পেলেন। একশটা পান চারশ রিয়েল, শুপারি প্রায় এক পোয়া তিনশ রিয়েল এবং ভাড়া ৩০০/- রিয়েল (তিনশত) একুনে ১,০০০/-(এক হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল। তাতে কি? পান তো পাওয়া গেছে। খুশি হয়ে নিজেরা খেলেন, মেহমানকে দিলেন, ফলে দুই দিন পর পান প্রায় শেষ। এখন কি হবে? বাধ্য হয়ে গোটা পানের বদলে অর্ধেক পরে তারও অর্ধেক অবশেষে সপ্তাহান্তে পানের হাহাকার। চারদিকে অনেক চেষ্টা করেও পান না পেয়ে শেষে শুপারি ও জর্দা খেয়ে খেয়ে সময় পার করেছেন। মন খুব খারাপ। যাহোক সে কথা মনে করে উনাকে বললাম, আমাদের দেশে কেউ এখনও কাদ চেনে না, ফলে সফরে যাওয়ার সময় ব্যাগে বেশি করে কাদ নিয়ে গেলে হয়ত কিছুদিন চলতে পারে। এবার তারা একটু খুশি হয়ে বললেন, তাহলে আমরা তোমাদের দেশে এক মাসের জন্য যাব। আমি তাদেরকে জানালাম যে, এলাকার জিম্মাদার সাথী ভাই আলী হাসান নাজ্জারী প্রত্যেক দিনই আসেন। সুতরাং আমরা তাকেই সব বলে যাব যেন তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। পরের দিনই হাসান ভাই এলে তাকে আহমদ সাহেবের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম। ঐ দিন দুপুরেও একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। ছেলেরা এসে ধরল তারা মেহমানদের গাধায় এবং উটের পিঠে উঠাবে। ওদেরকে খুশি করতে মওলানা মিজান, হাজী রঞ্জু ও সাইফুল ভাই ওদের সঙ্গে গেলেন। অবশ্য গাধার পিঠে কেউ না উঠলেও উটের পিঠে উঠে হাজী রঞ্জু পড়ে গেলেন এবং খানিকটা হাসির খোরাক যোগালেন। আসলে রঞ্জু হাজীর ভেতরে একটা চমৎকার শিশু সবসময় ঘুমিয়ে থাকে। বাচ্চাদের সঙ্গে উনার ভাব হয় খুব জলদি এবং সাইফুল ভাইকে নিয়ে উনার সারাদিনের খুনসুটি আমাদের অনেক সময়ই বিমলানন্দ দেয় এবং মজাই লাগে।

পরবর্তী মসজিদ "দারে যাইন" যাবার আগেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, এবার আমরা কোন ভাবেই স্থানীয় সাথীদের খেদমত নেব না। এ জন্য মসজিদে এসেই আমাদের খেদমতের সাথীরা বাজারে যাবেন বলে ঠিক ছিল। আমরা এখন শহরের অনেক কাছে চলে এসেছি। বাজার মাত্র দুই কি.মি.। ফলে খেদমতের দুই সাথী চুপচাপ বাজারে চলে গেলেন। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছর আগের ফয়সালা পাল্টাবে কে? যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। বাজারে যেয়ে উনারা তরিতরকারির দাম শুনছেন এর মধ্যেই এলাকার সাথীদের সঙ্গে দেখা। তারা তো হা হা করে উঠলেন। ইতোমধ্যেই তাদের বাজার হয়েছে, রান্নার কাজও চলছে। সুতরাং কোন কিছুই কেনা যাবেনা। বুঝিয়ে কাজ হলনা। শেষ পর্যন্ত কিছু খেজুর, তরমুজ ও খিরা কিনে নিয়ে তারা মসজিদে ফিরে এলেন। আমাদের অবস্থা "পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।"

এখানে অবস্থানকালীন তিনদিন তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হল না। গাস্তের দাওয়াত বলতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাদ খাওয়ার আসর এবং এক ঘরে সর্বোচ্চ পনর জন পেলাম। একটা খেলার মাঠে প্রায় বিশ/পঁচিশ জন ছেলে ফুটবল খেলছিল। দু'দলের মধ্যে মনে হয় ম্যাচ খেলা চলছিল। মাঠের বাইরে থেকে দলিল (রাহবার) সালাম দিতেই রেফারী নিজেই দলবল নিয়ে খেলা বন্ধ করে আমাদের কাছে চলে এলেন। দাওয়াতের কথা পুরা সময় সবাই চুপচাপ শুনলেন। তারপর আমরা মসজিদে চলে এলাম, খেলা আবার শুরু হল।

আগামীকাল মসজিদে দায়ারে জাবাল যাব। হঠাৎ রাত তিনটার সময় আমাদের পরবর্তী মসজিদে লিফট দেবার জন্য একটা টয়োটা পিকআপ মসজিদের সম্মুখে এসে পার্ক করল। সম্মুখে তিন জন মাঝে চার জন বসা যায়। পেছনের খোলা অংশে মাল সামানা থাকবে। সকালে নাস্তার পর বালিয়ারীর সমুদ্র পেছনে ফেলে ঐ গাড়ীতে রওয়ানা হলাম। বার দিন পর এই প্রথম পাকা রাস্তায় এলাম। সবাই খুশি। কিন্তু না, একজন পথ প্রদর্শক তুলে নিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে ঘুরে আবার সেই মরু পথে। তবে নূতন এই এলাকার জমি প্রায়ই সমতল। বালির মধ্যে মাটির মিশেল টের পাওয়া যাচ্ছে। তিন/চার মাইল যাওয়ার পরই চারদিকে বাবলা জাতীয় গাছের বন চোখে পড়তে লাগল। এদিকে ক্ষেতও আছে। জোয়ারীর গাছগুলো দেখে ভুট্টা গাছের মতো তাজা ও সতেজ মনে হচ্ছিল। এতদিন যে দুই/চারটা বাড়ীতে পোষা প্রাণী দেখেছি সেগুলো ছিল মূলত দুম্বা, দুই একটা ছাগল কচিৎ দেখেছি। তাও দিন-রাত্রি খোয়ারে বন্ধ অবস্থায়। এখানে বাবলা ও বাবলা জাতীয় বনে ছাগলের ছড়াছড়ি। ছোট্ট কোন মেয়ে অথবা ছেলে ছাগলের এক পাল যার অধিকাংশই বকরী সঙ্গে দুই একটা দুম্বা নিয়ে বনের মাঝে চড়াচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই চারিদিকেই কাঁটা গাছের দুর্ভেদ্য বেড়া। এ পর্যন্ত আমরা কোন শেয়ালের ডাক শুনতে পাইনি, তবে শিয়াল কেন,

বেজিও ঢুকতে পারবে না এই কাঁটা বেড়ার প্রাচীর ভেদ করে। প্রচুর মোরগ মুরগী ইতস্ততঃ খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। এখানেই প্রথম এঁটেল মাটির দেওয়াল চোখে পড়ল। বালুর মধ্যে মাটির মিশেল স্পষ্ট। প্রচুর কুল গাছ। তবে কুলের সাইজ খুব ছোট এবং গাছ ভরা এত কুল যে মনে হয় ডাল ভেঙ্গে যাবে। কুলকেও এখানে সিডর বলে। হঠাৎ দুইটা বটগাছের মতো কুল গাছ দেখলাম যার বের তিনজনেও পাওয়া যাবে না। বলতে ভুলে গেছি, দ্বিতীয় রাত্রে মসজিদে দাহরে বাইনে বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ জন বিভিন্ন এলাকা ও মসজিদের মেহমান এসেছিলেন, তাদের মধ্যে ভাই আব্দুল্লাহ নামে একজন ছিলেন যাকে সবাই হযরত আলী (রা.) এর পঁচিশতম বংশধর বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শান্ত, নম্র সদালাপি ভাই আব্দুল্লাহ এর কাছে তাদের বংশ লতিকা চাইলাম। তিনি পরে দিতে চাইলেন। যে বইটাতে এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার দাম ইয়েমেনি ৪,০০০/-(চার হাজার) রিয়েল। সানা বা হুদাইদাতে পাওয়া যেতে পারে বলে তিনি জানালেন। এশার নামায শেষে কিছু সাথী এবং রাত্রের খাবার খেয়ে বাকী মেহমান সাথীরা চলে গেলেন। ভাই আব্দুল্লাহর সাথে পরে আর দেখা হয়নি।

তালগাছের মাথা কয়টা হয়? সোজা উত্তর একটা। হয়ত কোন স্থানে ব্যতিক্রম দুইটাও হতে পারে। এখানে এমন গাছ খুবই কম আছে যার মাথা একটা। দুই, তিন, চারটা মাথাতো প্রায় প্রত্যেকটা গাছেরই। আমাদের মসজিদের কাছের একটা বাগানে মনে হল বেশি মাথা ওয়ালা গাছ দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার আগে আমি ও আটঘরিয়ার হাজী মিজান ভাই যেয়ে দেখি একটা গাছের আটটা মাথা। প্রথমে জমি থেকে একটা গাছ উঠে হাত খানিক উপরে যেয়ে চারটা ডাল হয়েছে এবং উপরে প্রত্যেক অংশে দুইটা করে ডাল হয়ে মোট আটটা মাথা। খবরটা আমির সাহেবকে বলায় উনি নিজেও স্থানীয় এক সাথীকে নিয়ে গাছ দেখে এলেন। কিন্তু এবার আরও চমক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওখান থেকে একটু দূরে অন্য একটা বাগানে যেয়ে আমরা অবাক হতে ভুলে গেলাম। মাটির উপরে উঠে গাছটি চার ভাগ হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগ উপরে উঠে আবারও চার ভাগ হয়েছে। সর্বমোট ষোলটি মাথা। তার মধ্যে একটা ডালের চার মাথার দুইটা মাথা মরা মরা হয়ে গেছে– মনে হল মরে যাবে। এ এলাকার প্রত্যেকটা তাল গাছই খুব চিকন এবং মাথার উপরের দিকে চার/পাঁচটা পাতা রেখে বাকি পাতা কেটে নেওয়া হয়। এই পাতা চিকন করে চিরে হ্যাট, ঝুড়ি, খাটলা ও বেড়া বাঁধার দড়ি ইত্যাদি তৈরি করার কাজে ব্যবহার করা হয়। খুব মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী হ্যাট এর মতো মাথাল তো মাঠে কর্মরতঃ প্রায় প্রত্যেক মেয়েদের এবং কিছু কিছু পুরুষের মাথাকে রোদ থেকে রক্ষা করে। মেয়েদের বোরখা ছাড়া এই মাথাল পরদারও কাজ করে। মানুষ জন দেখলে

মাথাল ঐদিকে কাত করে দেয়। পাতার চিকন ডাটাগুলো সুন্দর ও শক্ত ঝাঁটা হিসাবে ব্যবহার হয়। যাহোক সকালে খিচুরী খাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকানে যেয়ে আবার ধাক্কা খেলাম। দোকানে পেয়াজ ছাড়া মসল্লা নাই। কাঁচামরিচ চাইলাম, কিন্তু পাব কি ভাবে? ঝালকে এরা বিষ মনে করে। তাই কালজিরা এবং ঐ টাইপের অন্য এক রকম বিচি দিল। রসুন নাই। ফিলফিল (কাঁচামরিচ) এর বদলে শেষে বাড়ীর ভেতর থেকে দুইটা আধাভাঙ্গা শুকনা মরিচ দিল। রশুন বুঝাতে শেষতক পিয়াজ হাতে নিয়ে বলা হল এই রকম সাদা এবং ভেতরে অনেক গোটা মিলে একেকটা হয়। পরে বুঝতে পেরে একজন বাড়ী থেকে একটা বড় রশুন নিয়ে এল। এখানে এ্যাংকর ও সোয়াবিনের ডাল বেশি চলে। চাল প্রায় প্রত্যেক ছোট বড় দোকানেই পাওয়া যায়। এখানের তরমুজ (হাবহাব) গুলো আমাদের দেশের বড় বেলের সমান। ভেতরটা লাল এবং বেশ মিষ্টি। ঝাল হিসাবে অনেকে গোল মরিচও ব্যবহার করে। মরিচের ঝাল দেখলে বিষ বিষ বলে আতঙ্কিত আওয়াজ তোলে।

দিয়ারে জব্বাল-এ আমাদের থাকার কথা দুই দিন। এই মরু এলাকার মেয়াদ আমাদের জন্য বিশ দিনের। ফলে এই মসজিদে আমাদের থাকার মেয়াদ তিন দিন হলেও কোন একটি বিশেষ মসজিদে দুই দিন থাকতে হবে। এলাকার নাম জব্বাল–তাই মসজিদের নাম দিয়ারে জব্বাল। অন্যান্য মসজিদের মতো এরও উঠানের কিছু অংশ পাকা করা। গতকাল রোববার ৮/২/০৯ ছিল পূর্ণিমা। মসজিদের বাইরের চত্বরে মাগরিব এর নামাজের আগে জায়নামাজ বিছিয়ে জামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক স্থানীয় পাওয়ার সাপ্লাই কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ দিতে দেরী করল। ফলে ভরা পূর্ণিমার আলোয় এত চমৎকার একটা স্নিগ্ধ ও মায়াময় অবস্থার সৃষ্টি হল যা শুধুই অনুভবের। প্রায় সত্তর/আশি জন মানুষ– নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। অনেকটা ইংরেজি সাহিত্যের কবি কোলরিজের দি রাইম অফ দি এনসেন্ট মেরিনার কবিতার সেই “Painted ship in a painted occan”(আঁকানো সমুদ্রের বুকে আঁকানো জাহাজ) এর মতো মনে হল। ছোট বাচ্চা মজমায় প্রায় নাই বললেই চলে। এখানে দেখলাম, শ্রোতাদের মধ্যে যুবক শ্রেণীর সংখ্যাই বেশি। মনে হয় এলাকার যুবকেরা চাকুরীর চেয়ে জমিতেই বেশি কাজ করে।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যার আগেই খবর পেলাম বা'দাল-এশা আমাদের পরবর্তী মসজিদে চলে যেতে হবে। ভাই মওলানা আব্দুল আওয়াল গতকালই বিশেষ করে অনুরোধ করে এলাকার সাথীদেরও রাজী করিয়ে রেখে গেছেন। মসজিদুল হিন্দ এখান থেকে দশ/পনর কি.মি.। প্রথমে বড় রাস্তা দিয়ে উত্তরে যেতে হবে। সন্ধ্যার পর পরই গাড়ী এল। আজও মসজিদের বাইরেই চাঁদের আলোয় বয়ান হল। আজও অনেক মেহমান এসেছিলেন। নামায শেষ হতে না হতেই রাতের

খাবার এসে হাজির। স্থানীয় সাথীরা আমাদেরকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না। সুতরাং বসতে হল। স্থানীয় তিনজন সাথী দুই দিন হল আমাদের সঙ্গে তিনদিন এর সময় লাগাচ্ছিলেন। তারাও একদিনের জন্য আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হলেন।

ইয়েমেন এয়ারপোর্টে আমাদের ভিসা দিয়েছিল মাত্র দুই মাসের জন্য। এটাই এদেশের নিয়ম, বিশ/পঁচিশ দিন পর সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে হয় একটা মোটা অংকের ফিসসহ। পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজকে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ফিসসহ পাসপোর্ট জমা দেওয়ার কথা। সেই হিসাবে ভাই আলী হাসান নাজ্জারী ভোর বেলায় মোটর সাইকেল নিয়ে এ মসজিদে এসে হাজির। আমির সাহেবও আগে থেকেই তৈরি ছিলেন, তবু স্থানীয় সাথীদের অনুরোধে নাস্তা করেই দুই জনে হুদাইদার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আমির সাহেব ছিলেন আমাদের একমাত্র মুতারজেম। তবু আমাদের সঙ্গে মুতারজেম কেউ না থাকলেও আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে থেকে গেলাম। কথা ছিল বারটার মধ্যেই উনারা কাজ শেষে ফিরে আসবেন, কিন্তু হুদাইদায় মার্কাজের মাশোয়ারা ঐ দিন এশাবাদ ছিল বিধায় তাদের বেশ রাত করে ফিরতে হল। তবে এতে অবশ্য আমাদেরই লাভ হল। পরবর্তী বিশ দিনের রোখ মার্কাজ থেকে উনারা দিয়ে দেওয়ায় আমাদের আর হুদাইদা যেতে হবে না। বর্তমান মসজিদে তিনদিনের বদলে দুইদিন এবং পরের রোখের বিশ দিনের মেয়াদকে একুশ দিন করে দিলেন উনারা। যাই হোক ফয়সালা আসমানের এবং আমাদের জন্য সর্বাবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ।

এই এলাকা শস্য শ্যামল, দিগন্ত ছোঁয়া ফসলের ক্ষেত আমাদের দেশের ধান সবুজ মাঠের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে এখন ফসল তোলা সবে শুরু হয়েছে। বিশাল বিস্তৃত মাঠে বলিষ্ঠ জোয়ারীর ঘন সবুজ আস্তরণ। মাথায় সোনালীর বদলে গাঢ় চকলেট অথবা সবুজের আলপনা। মাঝে মধ্যেই ক্ষেতের মাঝে খোলা তৈরি করে ফসল কেটে জাগ দেওয়া হয়েছে। ধানের পালার মতো গোল করে এক আটির উপরে অন্য আটি না বিছিয়ে, এখানে আটি গুলি খারা লম্বা করে সাজানো হয়, ফলে দূর থেকে চুড়া উঁচু কুঁড়ে ঘরের মতো দেখায়। জমি দেখে মনে হল, এখানে ডিপ টিউব অয়েলের মাধ্যমে গম ও আলু চাষ করলে গোলায় ফসল ধরবে না। এসব কিছু দেখলাম জিয়ারার সময়– মাঠের মধ্য দিয়ে জোয়ারী বনের মাঝ দিয়ে এক শেখের খামার থেকে অন্য শেখের খামারে যাওয়ার সময়। এখানে আধুনিকতার আরো কিছু লক্ষণ টের পাওয়া গেল। কিছু কিছু বাড়ীর ভেতরে ঘরের সামান্য উপরে টিভির এন্টিনা দেখা যাচ্ছিল বলে। তবে বাইরে কোথায়ও টিভি বা রেডিও দেখা গেলনা এবং কোন বাড়ীর বাইরে থেকেই কোন প্রকার আওয়াজও পাওয়া গেলনা। ছোট ছেলেরা মসজিদে এবং ছোট মেয়েরা কোন বাড়ী বা চারদিকে ঘেরা কোন মাদ্রাসায় দিনে

প্রথম ব্যাচ ও বিকাল/সন্ধ্যায় এক ব্যাচ পড়তে আসে। উপস্থিতি প্রচুর এবং পড়ার ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আছে। এখানে এসে আরো একটা ছোট পরিবর্তন চোখে পড়ল। বোরখা কালো থাকলেও দুই একটা ছাত্রীর ওরনা রঙ্গীন। বাবলা গাছ প্রায় নাই তবে প্রচুর বড়ই গাছ এবং প্রতিটি গাছই অসম্ভব রকমের ফসলের ভারে অবনত। কিন্তু খাওয়ার মানুষ কৈ? খাওয়ার বিষয় খুব বেশি লিখেছি জন্য ভেবেছিলাম এ বিষয়টি আর কোন বর্ণনায় আনব না। কিন্তু আজ দুপুরের কথা না লিখে পরলাম না। এক শেখের বাড়ী দুপুরের দাওয়াতে গাড়ী করে নিয়ে গেল। আলহেলাল মসজিদে বয়ান করা সেই বিখ্যাত ইয়ামেনী আলেম ড. মওলানা আহমদ হোসেন জিবরান হঠাৎ করে দুপুরে এক নং ফুটবলের সাইজের কতগুলো খিরা ও একঝুরি কলা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে হাজির। খুবই গুনী মানুষ। প্রথমে সউদি আরবে পড়াশুনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে সুদান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন ছয় বৎসর। তারপর আবার কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বৎসর পড়ে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়েছেন। অসম্ভব ব্যস্ত মানুষ- বহু জায়গায় পড়াতে হয়। এলাকার তিনশত মাদ্রাসার তিনি প্রিন্সিপাল। তাছাড়াও অনেক সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আসায় আমরা খুবই খুশি হলাম ও আমরা উনাকে নিয়েই দলবেঁধে দাওয়াতে গেলাম এবং যথারীতি চমকে গেলাম। কমপক্ষে একেকটা ষোল/সতের ইঞ্চি করে লম্বা গোটা গোটা কালচাঁদা (রূপচাঁদার মতো ছোট সাইজের নয়) জাতীয় মাছ আগুনে ভাজা, প্রত্যেক বড় প্লেটে দুইটা করে। সঙ্গে গোস্তসহ অন্য তরকারী ছালাদ ইত্যাদি তো আছেই, কমপক্ষে দশ/বারটা মাছ। আল্লাহু খায়রুর রাজেকীন।

সকালের সালাতের পর বাইরে এলাম। এখনও সূর্য উঠেনি, পুব দিগন্তে হালকা লাল গোলাপী ছোপ পড়তে শুরু করেছে কেবল। পূর্ব দিগন্ত জুড়েই পাহাড়, হালকা কালো আঁকা বাঁকা উঁচু নিচু অসমতল খাঁজকাটা। মনে হল, আকাশে হেলান দিয়ে থাকা পাহাড়ের ঘুম এখনও ভাঙ্গেনি। একটু ক্ষণ পরেই বোধহয় ধরমর করে উঠে বসবে।

আমাদের দুয়ারে পালকি দাঁড়িয়ে। মওলানা ইয়াহ্‌হিয়া তার গাড়ী নিয়ে এসেছেন নূতন মসজিদে লিফট দেবেন বলে। ঐ এলাকায় তার ছোট ভাইয়ের বাড়ী। আজকেই সন্ধ্যার পর ভাই আব্দুল্লাহর বিয়ে। আবার এলাকার মাসতুরাত জামাতও কিছু পরে এসে তার বাড়ীতেই উঠবে। প্রচন্ড ব্যস্ততা তবু তিনিই লিফট দেবেন আর কাউকে সুযোগ না দিয়ে।

মসজিদটির নাম দারে খালাইয়া। বেশ বড় ও পুরাতন মসজিদ– পরে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মসজিদে পানির ট্যাঙ্কি নষ্ট। চিন্তার ভাজ কপালে- কিন্তু সমাধান হতে বেশি সময় লাগল না। সাথী ভাই মোটর সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন। আমাদের মাশোয়ারা শেষ হয় নাই– এর মধ্যেই গাধার পিঠের দুই

পাশে দুইটা করে চল্লিশ গ্যালন ভরা পানি নিয়ে ছোট ছোট মেয়েরা এসে হাজির। এক এক করে বারটা গ্যালন জমা হল। এর মধ্যেই বড় একটা ড্রাম এসে হাজির। বড় ড্রামে পানি ঢেলে রেখে বাচ্চাগুলো আবার গাধার পিঠে রওয়ানা হল। এর মধ্যে সাইকেলের ভটভটি বাজিয়ে সাথী ভাই ফিরে এলেন, সম্মুখে সাইকেলের উপরে বসানো খাওয়ার পানি ভরা ট্যাঙ্কি। সব মসজিদের এলাকায়ই দশটা থেকে বারটার মধ্যেই বরফ নিয়ে ট্রাক আসে। যার যা প্রয়োজন বরফের চাঁই নিয়ে খাওয়ার পানির ট্যাংকিতে ছেড়ে দেয়। সারাদিন রাত বরফ গলানো ঠান্ডা পানি খেতে বড় আরাম লাগে। পানি ঘরে নিয়ে রাখা হল এবং যথাসময়ে বরফ এল। অবশ্য ঠান্ডা পানিসহ ছোট একটা ট্যাংকি আগেই কেউ একজন দিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ পলিথিনের প্যাকেটে আমাদের জন্য কয়েকটি তুলসি পাতার মতো গুল্ম গাছের পাতাসহ ছোট ছোট ডাল নিয়ে একটি ফুটফুটে ছোট মেয়ে এসে হাজির। জিজ্ঞেস করে জানলাম এটা রাইয়ান গাছের ডাল ও ফুল। বেশ সুগন্ধি। বেহেশতী বান্দাদের জান কবজের সময় পাঁচশত ফেরেশতা এই ডাল নিয়ে এস্তেকবাল করতে আসবে। খুব যত্ন করে রেখে দিলাম।

দুপুরে বিয়ে বাড়ীতে দাওয়াত। এ দাওয়াত অবশ্য সাত দিন আগেই নাজারিয়া মসজিদে পাওয়া। এই সুযোগে এ দেশের বিয়ের কিছু খন্ড চিত্র পাওয়া গেল। মেয়েরা এখানে পিতামাতার গলগ্রহ নয়। সমগ্র আরবেই মেয়ের বিয়েতে বাপ মায়ের দুশ্চিন্তা নাই। ছেলে পক্ষকে মেয়ের নগদ মোহরানা দিতে হয় প্রচুর। এছাড়া মেয়ের কাপড়-চোপড়সহ অলঙ্কারাদি, প্রসাধনি, ওলিমার যাবতীয় খরচ সবই বরকে দিতে হয়। গালেব আব্দুল্লাহ আব্বাসী তবলীগের সাথীর মেয়েকে বিয়ে করছে। মাত্র দুই লাখ রিয়েল দেনমোহর দিতে হয়েছে। না হলে কমপক্ষে পাঁচ/সাত রিয়েল দিতে হত। এখানে বিয়েতে মেয়েদের বাড়ীতে কোন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা নিষেধ। যে জিনিষটি আমার কাছে বেশি গুরুত্ব পেল তা হল বিয়ের বাসর ঘর। চারদিকে ঘেরা ফসলের ক্ষেতের মধ্যে পাথরের ব্লকের প্রাচীর ঘেরা বাড়ী, দুইটা গাধা, তিনটা গরুওয়ালা সচ্ছল গৃহস্ত পরিবার। নিজস্ব সেচ ব্যবস্থাপনা। সকালেও আসার সময় আট/দশটা বোরখা পড়া মেয়েকে বাড়ী সংলগ্ন জমিতে কাজ করতে দেখেছি। এসব মেয়েদের স্বামীরা বিদেশে চাকুরী করে আর মেয়েরা পরের জমিতে কাজ করে। বিয়ে বাড়ীতে কোন সাজ সজ্জা নাই। যেখানে মেহমানদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার পাশেই একটা টং-এর মতো ঘর। দেওয়ালের জংলা গাছ-গাছরার মধ্যে তিলের গাছও দেখলাম। অন্যসব বাড়ীতে দেখা ঘরের মতোই গোল করে আবর্জনা দিয়ে ছাওয়া। ভেতরে দুই/তিনটা নূতন খাটলা ও কয়েকটা বালিশ। সম্মুখে ঢোকার একটি জায়গা– দরজাও বলা যেতে পারে। এটাই হল বরবধূর বাসর ঘর। রাত্রে একটা পর্দা অথবা চাদর দরজায় টাংগানো হবে। আর কোন কিছুই নাই। বাচ্চা

না হওয়া পর্যন্ত নতুন দম্পতি এই ঘরে থাকবে। বাচ্চা হলে পাশেই নিজের পাকা ঘরে স্বামী স্ত্রী পার হবে। হুজুর পাক (স.) এর ঘর এরকম সাধারণ ছিল। তাই এই রকম ঘরেই তারা নূতন জীবন শুরু করতে চায়। জানতে চাইলাম, এই পুরাতন ঘরের রহস্য কি? সে জানাল, ঘরটা তার দাদার। তাই এটা পারিবারিক ঐতিহ্য হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু ওর একার ক্ষেত্রে নয় বরং সামাজিকভাবেই ওরা এটা মেনে চলার চেষ্টা করে থাকে। বরের বাড়ীতেই দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট বড় সব ধরনের পুরুষ মানুষ দাওয়াতের খানা খেল। কিন্তু একটা ছোট্ট মেয়েকেও সেখানে দেখলাম না। বাড়ীতেও গান বাজনা বা হৈ চৈ নাই। পোলাও এর উপরে রাংতায় মোড়া গোস্ত ও বাটিতে সুপ। সবার জন্য একই রকম খাবারের ব্যবস্থা। শুনলাম, বর বিয়ে করতে যাবে রাত দশটায়। মনে মনে বরের বিয়ের সাজ গোজ ইত্যাদি দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। এশার নামাযের পর বিয়ে বাড়ীতে যেয়ে দেখি ওখানেই একটা খাটলায় বর বসে আছে। একটা খাটলার উপর একটা নতুন কম্বল বিছানো, তার উপর দুই ধারেই চারটা করে আটটা বালিস। এসব খাটলার প্রত্যেকটায় একজন করে বসতে হয়। দেখলাম এক দিকের বালিশে হেলান দিয়ে বর বসে আছে, অপর দিকের বালিশের সঙ্গে একটা কলাসনিকভ (এ,কে-৪৭)-রাইফেল হেলান দিয়ে রাখা। এখানে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই এ অস্ত্রটা আছে এবং বাড়িতে একটা বন্দুক থাকলে তা নিয়ে আমাদের যত সতর্কতা এদের তাও নেই। একটা লাঠি পড়ে থাকা আর রাইফেল পড়ে থাকা মনে হল একই রকম। বেশ কিছু ছোট ছেলেপেলে (কোন একটা ছোট মেয়েও নেই) ঘুরাঘুরি করছে। তারাও ওদিকে ফিরেও তাকচ্ছে না।

বর উঠে এসে আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করছে। দুপুরের পোষাকের সঙ্গে পার্থক্য যা দেখলাম তা হল, বর মেহেদী দিয়ে সারা শরীর ডলে নিয়ে গোসল করেছে। হালকা মেহেদীর রং টের পাওয়া যাচ্ছে। দুপুরের মতই একটা পুরাতন সার্ট ও লুঙ্গি। মাথায় টুপির উপর সাধারণ একটা রুমাল পাগরীর মতো পেঁচানো। নতুনের মধ্যে শুধু একটা মস্তবড় বেলী ফুলের মালা। প্রায় হাটু পর্যন্ত লম্বা। বিয়ের পর বর কনেকে এই মালাটাই পড়িয়ে দেবে। মেয়ের বাড়ীতে বরযাত্রীদের জন্য কোন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নাই। বর যাবে, বিয়ে পড়ানো হবে তারপর বরকনেসহ সবাই বাড়ী চলে আসবে। শুনেছি অধিকাংশ বিয়ের ক্ষেত্রেই একই রকম চিত্র। একার ক্ষেত্রে নয় বরং সামাজিকভাবেই ওরা এটা মেনে চলার চেষ্টা করে থাকে।

শরীয়ত মোতাবেক একসঙ্গে সর্বোচ্চ চারটা বিয়ে করার জন্য এদেশে কোনই বাধা, নিষেধ নাই-বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষ থেকে তো একদমই না। ধারাবাহিকতায় যদি দশটা বিয়েও করে তবু কোন আপত্তি নাই। স্বামীর সংসার

এদেশের মেয়েদের জীবনের সব কিছু। একটা জিনিস আমার কাছে অতীব সুন্দর লাগল। হায়াতুস সাহাবাতে সাহাবীদের যে রকম সহজ সরল জীবনের ছবি দেখেছি, সরল ও নিষ্ঠাবান যে জীবনের চিত্র মনের ক্যানভাসে কল্পনার তুলিতে অবচেতন মনে এঁকেছিলাম তাকে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি এলাকায় বাস্তবে প্রতিফলিত দেখছি। অবলোকন করছি আর মিলিয়ে নিচ্ছি ইতিহাস যেন বাস্তব হয়ে ধরা দিচ্ছে। এক হাজার চারশত বছর পরও সাহাবী ওয়ালা জিন্দেগী নিয়ে চলা যে সহজ ভাবেই সম্ভব তার বাস্তব প্রতিফলন এখানে একদম সহজ সরলভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হচ্ছে। নাই দ্বিধা, নাই উঁচু নিচুর ভেদাভেদ, নাই ধনী দরিদ্রের সামাজিকতার মধ্যে 'আর. সি. সি.' দিয়ে তৈরি করা দেওয়াল। পোষাকের বাহুল্য নাই কৃত্তিমতার চোখ ধাঁধানো জৌলুষ নাই, মিথ্যাকে সত্য দিয়ে ঢাকার অপপ্রয়াস নাই, এমনকি ছলনা দিয়ে ভুলানোর প্রবণতাও অনুপস্থিত। আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জানালাম যে, তিনি দয়া করে মায়া করে মেহেরবানী করে ইয়েমেনের এই গন্ড গ্রামে আমার মতো একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষকে এনেছিলেন। তাই ইসলামের সেই মন মাতানো চির সুন্দর চির সবুজ জীবনের কিছু স্নিগ্ধ আলো মনের মনিকোঠায় জমা করতে পারলাম। বারবার মনের মধ্য থেকে কে যেন আবেগ ভরে বলতে লাগল, ধন্য, আমি যে ধন্য। আলহামদুলিল্লাহ।

পাহাড়ী কন্যার ঝরোকায়

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল জাহারে মদিনা। প্রথম ২০ দিনের রোখ ছিল মরুভূমিতে– বালু আর বালিয়ারীর সমুদ্র মন্থন করে বাড়ী বাড়ী যেয়ে দাওয়াতের মেহনত করেছি। নদী সাগর সমতলভূমী ছেড়ে মরুর বালীতে অবগাহন করেছি হাতে পায়ে বালু লাগলে ঝাড়লেই পরিস্কার হয়ে গেছে। হাঁটতে যেয়ে বালুতে পা বসে গেলে মনে হয়েছে আল্লাহর প্রিয় হাবিব, সকল নবীদের সর্দার, রহমাতুল্লীল আলামিন এই রকম মরুভূমিতেই মেষ চড়িয়েছেন। দিন রাত্রি কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য দ্বারে দ্বারে বারে বারে ঘুরে ঘুরে হয়েছেন ক্লান্ত, অবিশ্বাসীদের দ্বারা হয়েছেন নিপীরিত ও লাঞ্ছিত। তার পরেও সারা রাত জেগে শ্রান্ত শরীরে আল্লাহর দরবারে করেছেন রোনাজারী। মাফ চেয়েছেন তাদের হয়ে যারা তাঁকে দিয়েছে অবহেলা আর অনাদর, ভালবাসার বদলে দিয়েছে অত্যাচার, ঘৃণা আর অপমান। তারপরেও মানবতার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন একটুও মুখ ফিরিয়ে নেননি বরং কেমন করে দাওয়াতের মেহনতকে আরো সফল করে তোলা যায় সেই চিন্তায় হয়েছেন বিভোর। যদি কোনদিন দুপুরের রোদে বালু যখন মুড়িভাজার মতো উত্তপ্ত গরম হয়ে উঠেছে, হঠাৎ করে সেই বালু পায়ে লাগলে মাথা পর্যন্ত তার তেজ অনুভব করেছি। মনে হয়েছে এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি উত্তপ্ত বালুর উপরে হযরত বেলাল (রা.) ও হযরত খাব্বাব (রা.) কে শুইয়ে রাখা হয়েছে ঈমানহারা করার প্রয়াসে। যেন নড়াচড়া করতে না পারেন সে জন্য বুকের উপর ভারী পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার আগে ও পরে তো অকথ্য শারীরিক নির্যাতনও সইতে হয়েছে। তবু মুখে এক বুলি 'আহাদ'। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁরা কেন যে "রাযিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু" হয়েছেন তা একটু হলেও বুঝেছি। কত কঠোর কঠিন আত্মত্যাগ করেছেন, কত ফকিরী জীবন যাপন করেছেন তা ভেবে বার বার অবাক হয়েছি। অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্ট্রিম রোলার চালানো ঐ যুগে জন্মালে আমাদের এই দুর্বল ঈমান নিয়ে আমরা কি আমাদের ঈমান ঠিক রাখতে পারতাম! না মুরতাদ হয়ে যেতাম! আল্লাহ আলিমুল গায়েব। তিনি আমাদের দুর্বলতা জানেন। তাই সেই কঠিন সময়ের পরীক্ষায় না ফেলে, আরামের এই নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবনে মুসলমান পিতা মাতার ঘরে মুসলমান সংখ্য গরিষ্ঠ দেশে জন্ম দিয়েছেন। লাখো কোটি শুকরিয়া তাঁর দরবারে। অগনিত বার বলি, আলহামদুলিল্লাহ।

পাহাড়ী কন্যার দেশ জাহারে মদিনা এখান থেকে পঁচিশ কিলোমিটার। পাকা রাস্তা দিয়ে দশ/বার কিলোমিটার যাওয়ার পর মেটে বালু কাঁকড়ের রাস্তা। ঘুরে ঘুরে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যখন পাহাড়ের রাজ্যে উপস্থিত হলাম তখন সবদিকেই পাহাড় দিয়ে ঘেরা। জাহারে মদিনার চেয়ে আরো উঁচু দুইটা পাহাড়

ওখানে আছে। সবচেয়ে বড়টা সাত হাজার মিটার। তবে সুবিধা এইযে এখানের সব পাহাড় মাটি আর পাথরের মিশেলে তৈরি। বড় বড় বোল্ডার যেমন আছে তেমনি আছে চাষযোগ্য সমতল ভূমি। সেখানে প্রচুর চাষবাস হচ্ছে। প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্তত দুই/একটা গাধা, প্রচুর ছাগল ও দুম্বা, কারো কারো বাড়ীতে উট। মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল তো প্রায় সব বাড়ীতেই আছে। যে মসজিদে আমরা উঠলাম তা বিরাট বড় একটা দোতলা মসজিদ, উপর তলায় মূলত মাদ্রাসা। মস্তবড় সুদৃশ্য পাঁচ তলা মিনার বহু দূর থেকেই চোখে পড়ে। ছিমছাম পরিবেশ। ডক্টর, মওলানা, হাফেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আহমদ আলী জিবরান-এর এলাকা। তিনি নিজেই উপস্থিত ছিলেন। গোটা ইয়েমেনের সবচেয়ে বড় তিনজন আলেমের মধ্যে তিনি একজন অথচ কত অমায়িক। প্রফেসর জিবরান মক্কায় পিএইচডি করেছেন। ওখানেও তার ভালই পরিচিতি আছে। মসজিদটি তিনি সৌদি আরবের অর্থানুকুল্যে বানিয়ে নিয়েছেন। সাদা কালোসহ বিভিন্ন রং এর পাথর দিয়ে গাঁথা, মিনারের ক্ষেত্রে অন্যান্য পাথরের সঙ্গে সিরামিক ইট ব্যব্যহার করেছেন। মিনারের নিচে মাটির তলায় গভীর ও বিরাট পানির ট্যাঙ্কি। ছাদের উপরে পড়া বৃষ্টির পানি বাইরের পাইপ বেয়ে নিচে এসে এই ট্যাঙ্কিতে জমা হয়। প্রায় সারা বৎসর অজুর জন্য এই পানি ব্যবহার করা হয়। অজুখানা ও টয়লেট একটু দূরে এবং টাইলস লাগানো আধুনিক ব্যবস্থাপনা, নিজস্ব জেনারেটরের বিদ্যুৎ, মেঝেও টাইলস দিয়ে করা। এক কথায় সুন্দর ও সুরুচির ছাপ এমনিতেই চোখে ধরা পড়ে।

আমাদের অনুরোধে দ্বিতীয় দিনের বাদ মাগরিব বয়ান ছিল মওলানা জিবরান-এর। তাঁর বয়ান মানেই শুধুমাত্র কুরআন ও হাদিস এর উদ্ধৃতি। মনে হয় যেন সামনে বই রেখে দেখে দেখে বলছেন। কোথায়ও কোনভাবে আটকায় না। দ্বীনের যে আমানত হুজুর পাক (স.) আমাদের কাছে রেখে গেছেন তার কতটুকু আমানতদারী আমরা আদায় করছি? এমনকি আমানতের বদলে খেয়ানতের জন্য যে দায়ী হয়ে গেছি সে বোধও কি আমাদের আছে? কতজন এ সম্পর্কে সচেতন? তার বয়ানে বারবার এ প্রশ্ন মনে জাগল। তবলিগের মেহনত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা শেষে তিনি ঈমান ও একিন নিয়ে আলোচনা করলেন যা অনেকটা এরকম:

হযরত মওলানা সাদ বলেছিলেন ঈমান শেখার চারটা রাস্তা বা উপায় আছে। প্রথমত: আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মখলুক এবং আল্লাহ খালেক। মখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর আল্লাহ সব কিছুই করতে পারেন সব কিছু ছাড়া এই বিশ্বাস দিলের মধ্যে পয়দা করা ও একথার দাওয়াত দেওয়া। যখন এ কথার দাওয়াত অন্যকে দেব তখন তা আমার দিলের মধ্যে একিন বা দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দেবে। হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন মখলুখ থেকে খালেকের দিকে নিজের রোখ ফেরালেন তখন আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন।

নমরুদ চার মাইল ব্যাপি আগুন জালালো, যে আগুনের উপর দিয়ে পাখি উড়ে গেলে সেই পাখি জ্বলে পুড়ে যেত। হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ আগুনে ফেলার পূর্ব মুহূর্তে হযরত জিব্রাঈল (আ.) নিজেই পাহাড়ের ফেরেশতা, পানির ফেরেশতা ও বাতাসের ফেরেশতা নিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু তারা সবাই ছিলেন মখলুখ। তিনি সাহায্য নিলেন না। আল্লাহর কাছেও আরজ না করে বললেন, আল্লাহ আমার অবস্থা সবই দেখছেন, তিনি যা চাইবেন তাই হবে। আল্লাহ তাঁর জন্য মাখলুখকে তার গুণ বদলিয়ে দিলেন, আগুন শুধুমাত্র তাঁর জন্য শান্তির আধার হয়ে গেল। আল্লাহর বস্তুর উপর আল্লাহর কুদরত কাজ করল। এর জন্য দুনিয়ার আসবারের কোন প্রয়োজন হল না। তাই মানুষ যখন কালেমার উপর মেহনত করে দিলের রোখকে একিনের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে করে নেয় তখন দুনিয়ার আসবাব এর উপর আল্লাহর কুদরত কাজ করে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর কুদরত আসবাবের মুখাপেক্ষি বা অধীনস্ত নয় বরং দুনিয়ার আসবাব তার কাজের জন্য আল্লাহর হুকুমের এবং তাঁর কুদরতের অধীন। হযরত যাকারিয়া (আ.) এর বয়স একশত বিশ বৎসর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স অষ্টানব্বই বৎসর। এ বয়সে সন্তান হওয়া আমাদের বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ হযরত যকারিয়া (আ.) সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোওয়া করলেন এবং আসবাবের ক্ষমতার বাইরে আল্লাহ মেহেরবানী করে তাঁকে সন্তান দিলেন। সুতরাং মন থেকে আসবাবের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন বলে একিন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: দিলের একিন পয়দা হওয়ার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ঘটনা সমূহ আলোচনা করা। হযরত নূহ (আ.) থেকে হুজুরে আকরাম (স.) পর্যন্ত কোরআনে যে সকল ঘটনার কথা আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন সে সম্পর্কে বেশি বেশি করে আলোচনা করা। আল্লাহ পাক এ সকল ঘটনা হুজুর পাক (স.) কে জানিয়েছেন শুধুমাত্র তাঁর একার জন্য নয় বরং সারা জাহানের সমগ্র মানবকুলের জন্যে। ঈমানদারদের জন্য এসব ঘটনা নছিহত স্বরূপ। এই নছিহত ঈমানদারদের দিলের একিনকে মজবুত করবে। আল্লাহর সকল ওয়াদা তাঁর দ্বীনকে মেনে চলার উপর। তাঁর ওয়াদা একশভাগ সত্য। মোমিন যখন একিনের মজবুতির কারণে আল্লাহর ওয়াদার ছায়াতলে পৌছে যাবে তখন দুনিয়া নিজেই তার দরজায় স্বেচ্ছায় এসে কড়া নাড়বে।

একিন তৈরির তিন নম্বর উপায় হল সাহাবা আজমাইনদের জীবনের ঘটনাসমূহ আলোচনা করা। হযরত মওলানা ইউসুফ (রহ.) হায়াতুস সাহাবা নামে যে কিতাব লিখেছেন তার মধ্যে সাহাবাদের ঈমান, আখলাক, মোয়ামেলাত ও মোয়াশারাত সম্পর্কে বহু ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। এসব গুণের কারণে আল্লাহ তাদের কিভাবে গায়েবী নুছরত ও সাহায্য করেছেন তাও সেখানে লেখা হয়েছে। এগুলো আমরা শিখব এ জন্য যে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি

করেছেন সেই মাকসাদকে, সেই উদ্দেশ্যকে যেন আমরা পুরা করতে পারি। বদলে কেউ যদি কোন আমলের বদলায় আল্লাহ কি কি নূছরত করেছেন, নামাজ পড়ে ব্যবসার কেমন উন্নতি হয়েছে, তবলীগ করে জীবনে কেমন বরকত হয়েছে এ উদ্দেশ্য যদি ওগুলো আমল করি তবে সেটা মখলুকের একিনকেই দৃঢ় করবে। আল্লাহর হুকুম পালন কে মুখ্য করবে না। ফলে তা ব্যর্থতার ভাগারে মুখ থুবরে পড়বে– আখেরাতে কোনই কাজে আসবে না।

শেষ উপায় যা একিন তৈরি করতে সাহায্য করে তা হল, এ সম্পর্কীয় হাদিসসমূহ বারবার শোনা ও পড়া। এক সাহাবী হুজুর (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি? সরল প্রশ্ন জন্য হুজুর (স.) সরলভাবে উত্তর দিলেন, যদি নেককাজ তোমাকে আনন্দিত করে এবং তোমার খারাপ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে তাহলে তুমি মোমিন। এখন আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি, ভাল খাবার, ভাল পোষাক যেমন আমাদের আনন্দের কারণ তেমনিভাবে আমার নামায, রোযা, আমার সকল নেক আমল কি আমাকে সে রকম আনন্দ দেয়? আসলে আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তাই অনুভূতিও কমজোর ও অকেজো হয়ে গেছে।

ঈমান ও একিনের পর আসবে ইবাদত। ইবাদতের বুনিয়াদ দুই জিনিষের উপর। প্রথমত: তাওহিদ এবং দ্বিতীয়ত: তাকওয়া। এর মধ্যে তাওহিদ হল বুনিয়াদ আর তাকওয়া হল সমস্ত নেক আমলের জড়। তাওহিদের বুনিয়াদের উপর আমার এবাদত হবে এবং সেই এবাদত হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। আল্লাহ সকল প্রকার হারাম থেকে আমাদের বাঁচতে বলেছেন, চাই সেটা কামাই রোজগার, ব্যবসা বা চাকুরী হোক আর মোয়াশারাত বা অন্য কিছু হোক। নামাযের জায়গা পাক যেমন জরুরী তেমনি জরুরী নামাজে দাঁড়ানো ব্যক্তিটির শরীরও নাপাক না হওয়া– এ নাপাক তার শরীরের রক্ত মাংসের নাপাক যা হারাম ভাবে অর্জিত খানা খেয়ে তৈরি হয়েছে। হযরত ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, মানুষ শুকরকে হারাম মনে করে, শুকরের গোস্তকে হারাম মনে করে ও ঘৃণা করে। আল্লাহপাক সুদকে হারাম করেছেন অথচ তা সত্বেত্ত সুদ খাওয়া বা ঘুষ খাওয়া আমরা শুকরের গোস্তের মতো হারাম মনে করিনা বা ঘৃণা করিনা। অথচ দুইটাই একই রকম হারাম, আর এই হারাম রোজগারের দ্বারা তৈরি রক্ত ও মাংসের কারণে আমার নামায ও আমার এবাদত আল্লাহার কাছে পৌঁছে না। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে।

বয়ান শেষে বাইরের কিছু মেহমান-সাথী তাকে নিয়ে মাশোয়ারায় বসলেন। প্রায় এক ঘন্টা আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, আগামীকাল আমাদেরকে অন্য একটি নূতন মসজিদে যেতে হবে। বিদেশী মেহমানকে তারাও চান। বর্তমান মসজিদটি আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু কি করা যেতে পারে? মুসাফিরের তো নিজের পছন্দে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নাই। মাশোয়ারাই আসমানের ফয়সালা। সুতরাং তা মেনে নেওয়াই কামিয়াবীর উপায়। আমরাও তাই অবনত

মস্তকে মেনে নিলাম। পূর্বের দুই মসজিদের বদলে তিনটা নতুন মসজিদে যাওয়া ঠিক হল জন্য এ মসজিদেও তাই তিন দিনের বদলে দুই দিন থাকব ঠিক হল।

কোন কারণ ছাড়াই রাত আড়াইটায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বাইরে গেলাম। চাঁদের আলোর বাঁধ ভেঙ্গেছে, উছলে পড়েছে আলো। সে আলোয় আমার মনে যে মোহ-এর সৃষ্টি হল তা কোন প্রকৃতি প্রেমিকের হলে খুব ভাল হত। তবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো চারদিকে পাহাড় ঘেরা নিচের সমতলভূমির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নিরব নিঝুম প্রকৃতি। গোপনে ফিসফিস করে পাহাড়ের কানে কি কথা বলছিল সে ভাষা আমার জানা নাই। মাঝে মাঝে বাতাসের হালকা সুরের অনুরণন জানিয়ে দিচ্ছিল, পাহাড় আর প্রকৃতির এই নিবিড় মমতাঘেরা ভালবাসার আলাপনের মাঝে আমি এক অহেতুক অনাহুত অতিথি। আপত্তি করছেনা কিন্তু খুব স্বস্তিও বোধ করছেনা। নিরব প্রকৃতি নিথর হয়ে আছে। নিচের সমতল ভূমিকে সবুজের আলপনা দেওয়া মস্তবড় একটা হালকা কালো জাজিম এর মত মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলি কালো নক্সা হয়ে দাঁড়িয়ে। অনেক না বলা সুর মনের দুয়ারে এসে বাইরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষা করছিল। এ অপূর্ব অপার্থিব সৌন্দর্য একমাত্র ক্বাদের ও কুদরতওয়ালা আল্লাহ পাকের পক্ষেই করা সম্ভব। জন মানবের কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু কিছু ফাঁকা ফাঁকা বাড়ী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো। দরিদ্রের বাড়ীতে প্রস্থর ব্লকের দালান। সেখানে কাঁটা গাছের ঘেরা দিয়ে বাড়ীর প্রাচীর বানানো। কোন কোন বাড়ীতে কাঁটা ঝোপের বেড়ার বদলে মাটি দিয়ে নিচের অংশ বানানো। উপরে যত্ন করে টং এর মতো চাল। আবছা আলো আঁধারীতে এগুলোও প্রকৃতির অংশ বলেই মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দূর থেকে মোরগের ডাক হালকা ভাবে কানে ভেসে আসছিল। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে ছিলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম বলতে পারবনা। হঠাৎ করে কাছেই একটা গাধা ডেকে উঠল একদম বেসুরো কর্কশ গলায়। তারপর পরই আরেকটা। মনে হল আবেশ ভেঙ্গে গেল। তবু আরো কিছুক্ষণ হয়ত থাকতাম, কিন্তু তাহাজ্জুদের নামায পড়নেওয়ালা সাথীরা জেগে উঠেছেন। ফলে আমিও নিজের কাজে মন দিলাম।

নাস্তা শেষ হওয়ার আগেই গাড়ী এসে দুয়ারে প্রস্তুত। এই মসজিদের সাথী ভাইরা গতকাল আমাদের রোখ তাদের মসজিদে করিয়ে নিয়েছেন। প্রস্তুতি ছিলই তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা হল শুরু। এবারের নূতন মসজিদটা অন্য একটা আরো উঁচু পাহাড়ে। এদিক সেদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠলাম। হুদাইদার পথে অনেক 'আরাক' (মেছওয়াক) গাছ দেখেছিলাম কিন্তু এখানে কোথায়ও আরাক বা জয়তুন এর গাছ দেখতে পেলাম না। পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থিত ছোট মসজিদ, তবে আধুনিক। এই প্রথম একটি মসজিদ দেখলাম যা শুধুই সাদা চুনা পাথরের টুকরা দিয়ে তৈরি। এলাকার সবচেয়ে মুরুব্বী আহমদ ভাইয়ের

বয়স আটাশি বৎসর। তিনিই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। টকটকে গায়ের রং, টিয়া পাখির ঠোটের মতো নাক, সফেদ চুল ও দাড়ি নিয়ে হাসি মুখে তিনি আমাদের বুকের মাঝে টেনে নিলেন। আমার দাদু থাকলে তিনিও হয়ত এভাবেই আমাদের কাছে নিতেন। পাহাড়ী এলাকা। পানি এখানে সবচেয়ে দুর্লভ ও দামী। তবুও কয়েকটি পানি ভর্তি চল্লিশ গ্যালনের কন্টেনার সাজানো। মেঝেতে কার্পেট ছিলই তবুও তার উপর গোটা ঘর জুরে নূতন তিনটা বড় কার্পেট বিছানো হল। এলাকার মানুষ একে একে এসে দেখা করছেন ও খোঁজ খবর নিচ্ছেন। কেমন যেন মাননীয় অতিথি অতিথি ভাব। জানলাম, এলাকার নাম বনি রুদ্দু, আর মসজিদের নাম মসজিদে দাহরে হুদ্দ। যোহরের নামাযের আগে জেনারেটর চালু হল। মাইকে আযান হচ্ছে। এরমধ্যে পানিবাহি ট্রাক এসে মসজিদের ট্যাঙ্কি পুরাপুরি পানি দিয়ে ভরে দিল। এই প্রথম পানির ট্যাঙ্কিতে করে পানি সরবরাহ করতে দেখলাম। নামায শেষ হতেই এলাকার মানুষ সবাই বসলেন, তা'রুফী বয়ান হল। আরো কিছু কথা হল। তারপর সবাই মিলে সামনের একটা বড় ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। মসজিদের দুই দিকে পাহাড়। একদিকে অনেক নিচে কিছু চাষাবাদ হয়েছে অপর দিকে চূড়ায় উঠে যাওয়ার মতো আঁকা বাঁকা রাস্তা আকাশ ছুঁতে এগিয়ে গেছে। আমাদের বসার ঘরটার একদিকে পাথর গেঁথে তার মধ্যে পাথুরে মাটি ফেলে সমতল করা হয়েছে। সেদিকে পাথর কেটে তৈরি করা সিঁড়ি প্রায় বিশ/পঁচিশ ফিট নিচে নেমে একটা বাড়ীর প্রাচীরের সাথে মিশেছে। অপর পাশে প্রায় পঞ্চাশ/ষাট ফুট উঁচা পাহাড়ের প্রাকৃতিক দেয়াল যার উপর দুই/তিনটা বাড়ী। সামনে একটা ফুল কড়ই গাছ শুকনা হলুদ ফল নিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। হঠাৎ করে দেখি ডান দিকের সেই উঁচু বাড়ীর দিক থেকে সাদা জোব্বা সাদা পাগড়ী পরা কয়েকজন যুবক ও তিন/চারটা শিশু হাতে কিছু নিয়ে নেমে আসছে। এর মধ্যেই বাম দিকের সিঁড়ি বেয়ে বেশ কয়েকজন যুবক, বৃদ্ধ ও শিশু উঠে আসছেন। তাদের সবার হাতে খাবারের থালা। প্রায় একই সঙ্গে উভয় দল এসে ঘরে ঢুকতে চাইল।

এদিকে ঘরের ভেতরে ছোট বড় ছাব্বিশ জন মানুষ আমরা আটটা খাটিয়ার উপরে কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে কথা বলছি। ঘরের বাইরে বসল খাবারের মেলা, তারপরেও দেখি খাবার নিয়ে ছোট বড় ছেলেরা আসছেই। আমরা অবাক হতেও ভুলে গেছি। থতমত খেয়ে আমির সাহেব জানতে চাইলেন, বিষয়টি কি? উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম। আমরা এসেছি জন্য তারা খুব খুশি। এ জন্য গ্রামের কেউ আজ মাঠে যাননি। সবাই মেহমানদারী করতে চান। কিন্তু যেহেতু দুই দিনে সবাই মেহমানদারী করতে পারবেন না তাই সব বাড়ী থেকেই খাবার রান্না করে নিয়ে এসেছেন। সব পুরুষ মানুষ একত্রে বসে মেহমানদের সঙ্গে খানা খাবে। যদি কিছু খানা বাঁচে তবে বরকতের জন্য তা বাড়ীতে নিয়ে যাবে। একেক বাড়ীর একেক রকম আয়োজন। কেউ নিয়ে এসেছেন পোলাও এর মত রান্নাভাত কেউ

সাদা ভাত, কেউ গমের পুরু রুটি কেউ জিনারের চিতাই এর মতো পিঠা, তার কোনটা আবার পাউরুটির মতো হাতে বানানো মুঠি পিঠা। সঙ্গে গোস্ত, মাছ ছাড়াও দই দিয়ে ভেজানো পিঠা যা খাবার শুরুতে খেতে হয়। কোন কোন প্লেটে সিদ্ধ ময়দা হাত দিয়ে ছেনে সুন্দর করে পিরামিডের মতো উঁচু করে বসানো যার চারদিকে তিন/চার ইঞ্চি উঁচু কাঁধা পর্যন্ত গাঢ় মধু জমিয়ে রাখা। এছাড়াও আছে কলা ও রুটি কুচি করে তৈরি এক রকমের মিষ্টান্ন যার উপরে ঘন ও পুরু করে লেপে দেয়া হয়েছে মধু। সঙ্গে আছে শশা, টমেটু, 'খাস' বা লেটুস পাতার ছোট ছোট টুকরা ও মুলা গাছের কচি কচি পাতা। আরো কিছু ছিল কিনা তেমন খুটিয়ে দেখিনি তবে দুই রকম গোস্ত অর্থাৎ দুম্বা ও মুরগী ছাড়াও দুই তিন রকম ভাজা মাছ তো ছিল অবশ্যই। ঘরের মধ্যে সবার বসা সম্ভব হলো না জন্য অনেকেই বাইরে বসলেন। আমি যে থালায় বসলাম সেটায় অদ্ভুৎ ও রুচিশীল মনের ছোঁয়া পেলাম। থালার কিনারার চারদিকে দুই ইঞ্চি হিসাবে ছোট করে কাটা টমেটু, শশা, 'খাস' ও মুলা পাতার টুকরা মিশিয়ে সুন্দর করে সাজানো। মধ্যে কয়েকটা ভাজা ছুরি মাছ, তার ধার দিয়ে ঘুরিয়ে মুরগীর গোস্তের বড় বড় টুকরা বসানো। নতুন জামাই বাবাজীর বিয়ের দিনের প্লেটের মতো। মুরগীর গোস্তের চার ধার দিয়ে দুম্বার গোস্ত সাজানো। সালাদ ও গোস্তের মধ্যে অল্প একটু জায়গা ফাঁকা। থালার এক পাশে দুম্বার চর্বির সুপ ও আরেক পাশে জিনারের চিতুয়া পিঠা ও রুটি-কলার তৈরি মধুর প্রলেপ দেওয়া মিষ্টির থালা। প্রায় পঁচিশ/ত্রিশটা বাড়ী থেকে খাবার এসেছে। সবাই আমাদের ছয় জনকে তাদের প্লেটে বসতে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু সব প্লেটে তো বসা সম্ভব না, তাই নিজের প্লেট থেকে মাছ অথবা গোস্ত এনে তুলে দিচ্ছেন। দুই হাত দিয়ে বাধা দিলেও মানতে চান না। এরমধ্যে একজন এসে বড় এক বাটি গোস্ত জোর করে প্লেটের উপর ঢেলে দিয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখি সব সাথীরই একই অবস্থা। তখনও বাইরে থালা হাতে কিছু বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। আমার এই অনুল্লেখযোগ্য কমদামী জীবনেও বহু নামী দামী মানুষের সাথে ডিনার খাবার সুযোগ হয়েছে। নাটোর গনভবনে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব, বিএনসিসির বিজয় দিবস প্যারেডের সুবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া, নাটোর জেলা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ২০০১ সালে আসা রাষ্টপতি এরশাদ, সেনাবাহিনী প্রধানদের সঙ্গে ডিনার ছাড়াও সরকারিভাবে ভারত সফরে যেয়ে ভারতীয় তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে ডিনার খাওয়ার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন। এমন কি সেই সফরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে চা চক্রে অংশ নেবারও সুযোগ আল্লাহপাক দিয়েছেন। ক্যাম্প কমান্ডান্ট হিসাবে ক্যাম্পের ও ক্যাম্পের বাইরে অনেক মন্ত্রীর সঙ্গেও ডিনার খাওয়া ও খাওয়ানোর সুযোগ হয়েছে। সেসব ডিনারে নামীদামী বহু মানুষ ও বহু খাবারের সমাহার দেখেছি। কিন্তু সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় মিশ্রিত সতর্কতা, নিজের খাওয়ার চেয়ে অতিথিদের অসুবিধা যেন না হয় এটা দেখা,

কোন কারণে মেহমান অসন্তুষ্ট যেন না হয় সেদিকটাই ছিল প্রকট ও প্রধান। শুধু প্রাণভরা ভালবাসাই তেমনভাবে চোখে পড়েনি। কিন্তু এখানে নদীর দু'কূল ছাপানো বন্যার মতো ভালবাসা, হৃদয়কে উজাড় করে দেওয়ার মতো আন্তরিকতা এতই স্পষ্ট যে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা কাউকে দেখিয়ে দিতে হয় না। হৃদয়তটে আছড়ে পড়া ঢেউ এর মতো তা হিল্লোলিত, তরঙ্গায়িত ও উচ্ছ্বসিত ধারায় মনকে সিক্ত করে তোলে। মনে প্রশ্ন জাগে এত ভালবাসা রাখার মতো বড় হৃদয় কোথায় পাব? নিজের ক্ষুদ্রতা এত বেশি করে চোখে পড়ল যে, নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছা করল। হুজুর পাক (স.) এর সাহাবীরা ক্ষুধার্থ শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে নিজেরা না খেয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে ক্ষুধার্ত অতিথিকে তৃপ্ত করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু যখন দরজায় সজোরে কড়া নাড়ছে তখনও মরুভূমির মতো আকুল করা পিপাসার সময়ও নিজের পিপাসা অবদমিত করে সাথী ভাইয়ের দিকে শান্তিবারি এগিয়ে দিতে পানি বহনকারী ভাইকে অকুণ্ঠ অনুরোধ করেছেন। তারা সেই সাহাবীদের বংশধর, তারা সেই ইয়ামেনীদের অধস্তন গোষ্ঠী। নিজের জমীর পেকে উঠা ফসল কাটা বন্ধ রেখে আমাদের জন্য হৃদয় উজার করা ভালবাসা প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে, আমরা দ্বীনের মেহমান। আল্লাহর কাছে দ্বীন বড় মাহবুব এবং আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য ঘর ছেড়েছি। ছোট একটা কাগজ ছাপিয়ে তার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্ণর স্বাক্ষর করেছেন, ওই কমদামী কাগজটাই সঙ্গে সঙ্গে একহাজার টাকার মূল্যমান পেয়ে গেছে। তাই আমাদের মতো বিশেষতঃ আমার মতো নাচিজ অযোগ্য মানুষও ফুলের তোরার নিচের ডাঁটা বাধা সুতা হয়েও তোরার সঙ্গে একত্রে হাতে হাতে ঘোরার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ! তোমার মেহেরবানীর কোন তুলনা হয়না। তোমার করুনার তুলনা শুধুই তুমি! হঠাৎ মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, এই যে এত অমূল্য খাদ্য সম্ভার দিয়ে পেট ভরালাম আমি কি তার যোগ্য ছিলাম? যে নিয়ামত খেলাম তা থেকে যে শক্তি হবে তা কি আল্লার রাস্তায় প্রকৃতই খরচ করতে পারব? ফার্সী বয়াত মনে হল যা বাংলা তর্জমা করলে এমন বলা যায়:-

একটা রুটি আসলে হাতে খেয়োনা তা গাফলতীতে
মাটি পানি সৌরজগৎ কাজ করেছে এর পিছেতে।
ছিলাম একটা গমের দানা, মিলে মিশে খাটলো সবে
অনুমতি দিলেন খোদা, হলাম তোমার রেজেক তবে।

সেই রেজেকের আমরা সদ্ব্যব্যবহার করছি তো? মনে মনে এসব কথা ভাবছি এর মধ্যেই খানা শেষ হবার আগেই ছোট ছোট গ্লাসে চা এসে হাজির। এখন বসে বসে সবার সঙ্গে কাপের পর কাপ চা খাওয়া ও গল্প করা। নানা প্রশ্ন ও তার উত্তর এবং গ্লাসের চা শেষ না হতেই জোর করে আবার 'শায়ে' (চা) দিয়ে গ্লাস ভরে দেওয়া, এটাই চলল অনেকক্ষণ। এর মধ্যে যার বাড়ীর খাবার যা বেঁচেছে তা তাদের বাড়ী চলে গেছে। এখন উঠার পালা। কিন্তু ভালবাসার তীব্র

অনুভূতির জ্বর আমাদের তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবু উঠে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরেই তালিম শুরু হবে, তার আগে একটু কায়লুলা করতে হবে তো।

বিকেলে উমুমী গাস্ত শেষে ফিরে এসে দেখি দুই/তিন জন অচেনা মেহমান আমির সাহেবের সাথে কথা বলছেন। আমির সাহেব অক্ষমতা প্রকাশ করছেন কিন্তু তারা নাছোড় বান্দা। কাছে গেলাম। এ কি আজব ব্যাপার। উনারা 'সাওয়া' এলাকা থেকে এসেছেন। বাংলাদেশী জামাত এ এলাকায় এসেছে অথচ তাদের এলাকায় যাবে না এটা কি করে হতে পারে! তারা তাদের এলাকায় বিশ দিনের জন্য জামাত চান। মাশোয়ারা করে ঠিক হল যে, বিশ দিন নয় বরং দশ দিনের জন্য আমরা যেতে পারি। তবে শর্ত এই যে, হুদাইদা মার্কাজ থেকে তাদেরই এটা মঞ্জুর করিয়ে আনতে হবে। তারা খুশি হয়ে চলে গেলেন ও বলে গেলেন, প্রত্যেক দিনই তাদের এলাকার দুই একজন সাথী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ অনেক রাত্রে এসে দেখা দিল। ম্লান ও বিবর্ণ আলোতে আলো আঁধারীর মধ্যে লুকোচুরি খেলায় মেতেছে গিরিকন্যারা। চারদিকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছোট বড় পাহাড়ের মৌন নিশ্চুপ সমাবেশ। মুখরা প্রকৃতি যেন মুক হয়ে কোন অদেখা অজানা অতিথির জন্য প্রতীক্ষায় কাতর হয়ে বেদনার ভাষাহীন নিথর নিস্তব্ধতায় আত্মমগ্ন। তার মুক মুখে কখন ভাষা ফুটবে সেই প্রত্যাশায় ও সমবেদনার সাথী হয়ে দূরে কাছে মোরগের সরব সাহস যোগান দেয়া ডাক শোনা যাচ্ছে। যতদূর চোখ যায় চারদিকের পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত সবুজ গালিচার নিরব হাতছানি। আহা! এমনি ক্ষণে তারে বলা যায় এমনি মায়াময় আলোছায়। কিন্তু আমিতো কবি নই। সাথীর উদ্দেশ্যে মেঘের চাদরে মুড়ে মরমের বাণী পাঠানোও শিখিনি। তাই চুপচাপ বসে বসে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে একাকি ভোরের দিকে শুধুই এগিয়ে গেলাম।

দায়ারে হুদ্দ হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় মসজিদে আবু রোকবাহ হয়ে পাশের আরেক পাহাড়ের চূড়ার মসজিদে আল মাসাফ পর্যন্ত একই রকম মেহমানদারী চলল। তবে এই পুরা এলাকায় দাওয়াতের মেহনত সম্পর্কে কেউ কিছুই জানেন না। দেশী বিদেশী কোন জামাত আমাদের আগে এখানে কোনদিন আসেননি। আমরাই এই না চষা জমিতে প্রথম হালচাষ দিলাম। প্রচন্ড চেষ্টা চলল দাওয়াতের মেহনত সম্পর্কে অবহিত ও আগ্রহী করে তুলতে। মনে হল বেশ কাজ হচ্ছে। জামাত উঠছেনা কোথায়ও কিন্তু মসজিদওয়ারী জামাত তৈরি ও মাশোয়ারা এবং কেতাবী তালিম করতে সব মসজিদেই মুসল্লিরা রাজী হলেন সানন্দে। এখন জমির ফসল কাটার প্রচন্ড চাপ। কথা দিলেন, এরপর সময় করে তারা হুদাইদার মসজিদ মার্কাজে তিন দিনের জামাত নিয়ে যাবেন। তবে খুব চেষ্টা করবেন আমাদের সঙ্গেই কোন মসজিদে তিনদিন সময় লাগাতে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জামাতের জন্য নামও লেখালেন এবং কেউ কেউ বাংলাদেশেও আসতে

চাইলেন। মওলানা আহমদ আলী জিবরান এদের সবার শ্রদ্ধেয়। তার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন মনে করেছিলাম। আল্লাহর মেহেরবাণীতে মওলানা নিজেই এসে দেখা সাক্ষাত করলেন বয়ানও করলেন। তারপরেও মনে তৃপ্তি এলনা। এমন সময় পুরানো এক সাথীভাই খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দিলেন। কৃষক প্রথম যখন কোন অনাবাদি জমিতে হাল দেয় সে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ জমিতে নিজে ফসল বোনেনা। যে ঐ জমিতে ফসল বোনে সে হয়ত ফসল তোলে না। যে ফসল তোলে সেও হয়ত খায় না। খায় অন্য জনে। সে রকম এই যে আমরা এই অনাবাদি জমিতে মেহনত করলাম, একদিন এই মেহনত থেকেই ইনশাআল্লাহ জামাত উঠবে। সেটাই হবে আমাদের সার্থকতা। সবচেয়ে বড় কথা, রুগী মারা গেলেও ডাক্তার তার ভিজিট ঠিক পেয়ে যায়। সুতরাং আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবেনা।

অবশেষে শেষ হল পাহাড়ের চড়াই উৎরাই এর উঠা-নামা। আমাদের এবারের গন্তব্য পাহাড়ের পাদদেশের সবুজে ঘেরা মসজিদ দাহারে কাফালা। গ্রাম ছোট, মসজিদ আরো ছোট। কিন্তু তাতে কি? সন্ধ্যায় আশে পাশের বিভিন্ন মসজিদগুলো থেকে আসা মেহমানদের উপস্থিতিতে অন্য মসজিদ গুলোর মতো প্রচুর মুসল্লির উপস্থিতির কারণে এখানেও মাইক দেওয়া হল। প্রায় এক ঘন্টার উপর বয়ান হল। এরপর তাশকিল। তারপরেও মওলানা জবরান নিজেও তাশকিলসহ বয়ানে আধঘন্টা সময় নিলেন। এশার নামায আরম্ভ হল সাতটার বদলে সাতটা পঁয়তাল্লিশ মি.। কিন্তু তাতে কি? লোকজন নামায পড়েও বসে বসে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেই থাকল। শেষ পর্যন্ত পৌনে দশটার সময় আমির সাহেব নিজেই ক্লান্ত হয়ে মজমা ভাঙ্গতে বাধ্য হলেন। আমরাও নিজের নিজের জরুরত নিয়ে ব্যস্ত হলাম। সকালের বয়ান শেষে বাইরে এলাম। দিগন্তের কোলে প্রকৃতির স্বপ্ন কন্যারা তখনও আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেনি। নীড়ের পাখিরা তখনও গেয়ে উঠেনি ঘুম ভাঙ্গানিয়া গান। স্নিগ্ধ মধুর নূরের হাওয়া ঝিরি ঝিরি বয়ে যাচ্ছে শরীর ও মনে হালকা পালকের পরশ বুলিয়ে। মনটা ভরে উঠল আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকনে। মনের গভীর থেকে কে যেন বার বার বলতে লাগল, সুবহানাল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ।

সকালের নাস্তা করা আমাদের প্রায় শেষ। হঠাৎ একটা গাড়ী এসে মসজিদের লাগোয়া রাস্তায় থেমে গেল। হাসি মুখে যে মানুষটি মসজিদের ভেতরে পা রাখলেন, তিনি মোহাম্মদ ইবনে মোহম্মদ, লোকেরা ডাকে মোহাম্মদ ছগীর বলে। হাসি খুশি প্রানবন্ত সুঠাম পুরুষ। বড় মিঠা ব্যক্তিত্ব– সবাইকে কাছে টানেন। এসেই বললেন, পাঁচ মিনিটে সবাই রেডি হন। আমরা এখনই বের হব। আসলে মোহাম্মদ ছগীর ভাই সেই অবিস্মরণীয় আপ্যায়নের মসজিদ দাহরে হদ্দ এর একজন নূতন সাথী। গত তিন/চার মসজিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি তবলীগ পছন্দ করেছেন। ওখানে থাকতেই আমাদের বলে রেখেছিলেন যে,

'ওয়াদিয়ে মুর' এ তার ফার্ম আছে, সেখানে গেলে দাওয়াতের মেহনতও হবে এবং বিশিষ্ট স্থানটিও দেখা হবে। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি। এমন সুযোগ তবলীগের চিল্লায় সাধারণতঃ দূর্লভ। তাই আমরা সঙ্গে সঙ্গেই রেডি।

আসলে ওয়াদিয়ে মুর একটা পাহাড়ী বৃষ্টির পানি সদ্ব্যবহারের সুন্দর একটা পরিকল্পনা । জায়গার নামে পরিকল্পনার নাম। পাহাড়ে বৃষ্টি হলে সে পানি যেদিক দিয়ে নামে তাকে বলে 'ওয়াস'। প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এ সব ওয়াসের দুই ধারে হালকা উঁচু পাড়, নিচে বিশ/পঁচিশ হাত চওড়া সমতল ভূমি, বৃষ্টির পানিতে হঠাৎ গজিয়ে উঠে নদীর মতো। ওয়াদিয়ে মুর এ বেশ কয়েকটা পাহাড়ের বৃষ্টির পানির ওয়াসকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা বড় ওয়াসের মাধ্যমে একস্থানে জমা করা হয়েছে। এই পানি পাঁচটা সুইচ গেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে কৃষিকাজের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। প্রায় পঁচিশ/ত্রিশ বৎসর আগে চীনা প্রযুক্তি ও তত্ত্বাবধানে কাজটি করা হয়েছে। আমরা যে এলাকায় গেলাম সেখানের সুইচ গেটটিতেই প্রথমে ওয়াসের পানি জমা হয়। পানির মজুদ পুরা হয়ে গেলে গেটের মুখ বন্ধ করে দিলেই বৃষ্টির পানি পরের রিজার্ভে যেয়ে জমা হতে থাকে। এভাবে পাঁচটা রিজার্ভই ভরে গেলে অতিরিক্ত পানিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওয়াদিয়ে মুরে পানির প্রবেশ মুখটি বেশ বড়। জমানো এই পানি নিয়ন্ত্রিত তিনটি মুখ দিয়ে তিন এলাকায় ছাড়া হয়। প্রত্যেক রিজার্ভ এলাকার জন্য তিনটি করে ক্যানেল। মূল ক্যানেলটার দুই ধারে চওড়া করে বাঁধ দিয়ে তার উপরে গাড়ী চলাচলের রাস্তা বানানো হয়েছে। প্রায় দুইশত পঞ্চাশ/তিনশত গজ পরপর একটা করে লোহার ব্রীজ দুই পাড়ের রাস্তাকে সংযুক্ত করেছে। এই কৃত্রিম পানি সঞ্চালনের সুফল দেখে অবাক হতে হয়। যেমন ওয়াদিয়ে মুর-এ পৌঁছার দুই/তিন মাইল আগে থেকেই দূর থেকে ঘন গাছের বন চোখে পড়ল। কাছে এসে দেখি– বিশাল আম বাগান। দুইশত/তিনশত নয় বরং কয়েক হাজার আম গাছ লাগানো হয়েছে তিন/চার মাইল এলাকা জুরে। মধ্যে কোন ফাঁকা জমি নাই। সব গাছেই প্রচুর আম ধরে আছে। অনেক গাছেই পেলা/ঠেকা দেওয়া হয়েছে। সুদান থেকে নিয়ে আসা কলমের প্রায় সব গাছের আম দুই অথবা তিন ফলা। কোন কোন গাছ এমনও দেখলাম যে একই গাছে কিছু আমে রং ধরে গেছে ঐ একই গাছে কিছু ছোট আম যেমন দেখলাম তেমনি দেখলাম মুকুলও। কিন্তু আম্রপালী জাতীয় উন্নত ও উৎকৃষ্ট প্রজাতি নয় বরং এক ধরনের আধুনিক সংকরায়ন ও সবগুলি একই জাতের আম। ভেতরে কিছু আশ আছে। সাইজ ছোট, সাত/আটটায় কেজি হবে বলে মনে হল। শুনলাম, এখানে চার/পাঁচ মাস আম পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশের মতো লেট ভ্যারাইটি যেমন, আশ্বিনা, ফজলি ইত্যাদি ধরনের আম এখানে হয় না। রাস্তার পাশে মাঝে মধ্যেই পাম্পমেশিনে লম্বা রাবারের পাইপ দিয়ে বাগানে পানি দেয়া হচ্ছে। ডান দিকে পুরাটাই আমগাছের বাগান। বাম দিকে মাঝে মধ্যে আম বাগান ছাড়াও সবজী ও ফসলের ক্ষেতও প্রচুর।

এখানে মেহেদীরও ক্ষেত দেখলাম, থোপা থোপা ঝোপের মতো হয়ে সারা ক্ষেত জুরে আছে। একেকটা থোপায় দশ/পনর টা চিকন ডাল, আট/দশ ইঞ্চি করে লম্বা। শুনলাম, মেহদী গাছ বেশি বড় হলে সেই পাতায় ভাল রং হয়না। তাই ছোট অবস্থায় বার/চৌদ্দ ইঞ্চি হলেই সব ডাল গোড়া থেকে কেটে মেহদী সংগ্রহ করা হয়। পরে আবার গোড়া থেকে নূতন কুশি বের হতে থাকে। এই জমিতে যতদিন সম্ভব শুধু মেহদীরই চাষ হয়।

প্রজেক্টের ভেতরে ঢুকে মন ভরে গেল। নিজস্ব জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে প্রজেক্টের কাজ চলছে। এখন অফ সিজিন, তবু বড় ওয়াসে কিছু পানি এখানে ওখানে জমা হয়ে আছে। এক ধারে নয়নাভিরাম ঘন সবুজ বাবলা বন। একদম সতেজ সবুজ। তার ভেতরে থেকে হঠাৎ একটা উট বেরিয়ে এল। তাই দেখে এক সাথী সজোরে আল্লাহর শুকুর করে উঠলেন। পরে আরো কয়েকটা উট বিভিন্ন স্থানে বাবলা বনের মধ্যে দেখতে পেলাম। বেশ কিছু সাদা বক ও পানির ধারে সাদা ফ্রক পড়া চঞ্চল শিশুর মতো ছটফট করে ঘুরে ঘুরে আহারের সন্ধ্যানে মহাব্যস্ত। কিছু ছোট স্নাইপ (চাপাখি)ও দেখলাম। কি কি দেখলাম তার চেয়ে সবকিছু মিলিয়ে কেমন দেখলাম সেটা প্রকাশ করতে পারলেই ভাল হত। তবে আমার ভাষায় প্রকাশের অক্ষমতাকে ছাপিয়ে অদ্ভুৎ এক ভাল লাগার অনুভূতি হৃদয় মনকে ছুঁয়ে ফেলল। মানুষের তৈরি কিছু সুন্দরও দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি এতবেশী সুন্দর যে, তা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইয়েমেনের সব পাহাড় মূলত 'ছাবত আল নুয়েরা' পর্ব্বত মালার অংশ বিশেষ। গায়েম, মোরখান, সোফায়েত, দাহার ইত্যাদি সবই এদের শাখা প্রশাখা। আমাদের পরবর্তী মসজিদ এর নাম মসজিদ আল গায়েম। একটা বড় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গেলেই হবে। মোটামুটি এক মাইলের কিছু বেশি রাস্তা। কিন্তু আমাদের পক্ষে হেঁটে তা পার হওয়া সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে মওলানা জিবরান গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। অবাক কান্ড। এই এক মাইল রাস্তার বিপরীতে প্রায় এক ঘন্টা বিভিন্ন রাস্তা ও পাহাড় ঘুরে আমরা গায়েম এ এসে পৌছালাম। রাস্তা এতই বন্ধুর ও ভয়াবহ যে, এ রকম কঠিন পথে এর আগে আমরা আসিনি। মাঝে মাঝে কিছু পাকা রাস্তা থাকলেও কাঁচা পাহাড়ী চড়াই উৎরাই পার হতে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে গেল। তবু আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া, ভালভাবেই মসজিদে এসে পৌছানোর ব্যবস্থা আল্লাহপাক করে দিলেন।

যে পাহাড়ে আমরা এসে পৌছালাম তার নাম জাবালুল মোরখান। এর একপাশে জাবালুস সোয়েত্ত অপর দিকের পাহাড়ের নাম জাবাল আদ দাহের। এখানে মোটামুটি সমতল ভূমি হলে তাকে বলে মুর যেমন ওয়াদিয়ে মুর। মসজিদের এই এলাকাটির চারদিকে শুধুই ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা। বিচ্ছিন্ন কিছু বাবলা গাছ ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়ে না। বেশ কিছু বাড়ী, একটা

হাসপাতাল, একটা বড় মাদ্রাসা ও দুইটা ছোট ছেলে ও মেয়েদের পৃথক মাদ্রাসা এবং একটা বড় বাজার। এখানে সবখানে শুধুই আরবী পড়ানো হয়। ছোট ছোট বাচ্চারাও সুন্দর ও সঠিক উচ্চারণে কোরআন শরীফ পড়ে। তিন/চার বৎসরের বাচ্চারাও মসজিদে আসে। বেশ কিছু হাদিসও ছোট থাকতেই তাদেরকে মুখস্ত করানো হয়। নিম হাফেজ প্রচুর। হাফেজও অনেকে তবে এ জন্য তেমন কোন বিশেষ মর্যাদা পুরা দেশের কোথায়ও দেখলাম না। মসজিদের নামাযের সময় হলে যে কেউই ইমাম হয়ে নামায পড়ায়। ইমাম আসা বা না আসা নিয়ে তেমন কোন মাথা ব্যাথা নাই। অতিরিক্ত বন্ধুর ও অনুর্বর জমির জন্য এখানে জমিতে ফসল চাষের চেয়ে মূলতঃ ছাগল ও দুম্বা পোষা হয়। গোটা এলাকায় দেখলাম, এখানের মেয়েরা অসম্ভব পরিশ্রমী। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাধায় চড়ে পানি আনা, জমির ফসল গাধায় বোঝাই করে বয়ে বাড়ী আনা, রান্নার জন্য জমিতে যেয়ে জোরার গাছ, কাঁটা গাছ ও শুকনা ডাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা, দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুই/তিন বার বাড়ীর সকলের জন্য ব্যবহারের সব পানি দুই/তিন মাইল দূরের কুয়া থেকে তুলে আনা, ফসল কাটা, জমিতে কাজ করা, ছাগল দুম্বা চড়ানো, সে সঙ্গে বাড়ীর খাবারের জন্য জোরা পিষে আটা করা থেকে রান্না বান্না করা সব কিছুই মেয়েরা করে। স্বামীর মুখে তর্ক করা বা আপত্তি করার কথা এরা ভাবতেই পারেনা। সর্বাবস্থায় স্বামীর সংসারের সব কাজ ও দায় দায়িত্ব সে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করে। তবে কোন অবস্থায়ই বোরখা বা কঠোর পর্দা ছাড়া তাদের দেখা যায় না। সাত/আট বছর হতেই বোরখার সঙ্গে হাত ও পায়ে মোজা এবং আর একটু বড় হলেই মুখে নেকাব ব্যবহার করে। তারপরও বাইরে আসলে অধিকাংশ সময়ই মাথায় তাল পাতার মাথাল বা হ্যাট থাকে। স্বামী একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করতে চাইলে কোনই বাধা নাই, অধিকন্তু কাজের একজন সাথী বাড়ল জন্যই বোধ হয় কোন আপত্তি করে না। বিয়ের দিন স্বামীর সঙ্গে চলে এসে সাত দিন পর স্বামীর সঙ্গে এক বেলা বা এক দিনের জন্য বাপের বাড়ী যাওয়া এবং ফিরে আসার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাপের বাড়ীর সঙ্গে মোটামুটি যোগাযোগ এখানেই শেষ হয়ে যায়। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বাপের বাড়ী থেকে কেউ যেমন আসেনা তেমনি এ বাড়ী থেকেও তেমন কেউ যায়না। এটাই সামাজিক নিয়ম।

খুছুছি গাস্তে মাদ্রাসায় যেয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে গতকাল কিছু কথা বলা হয়েছিল। আজকে এগারটায় তারা সবাই আমাদের কথা শুনবে বলে জানিয়েছিলেন। সে জন্য দশটার পরপরই আমরা প্রথমে ছোট ছেলেদের একটা মাদ্রাসায় গেলাম। সেখানে আট জন শিক্ষককে একসঙ্গে নিয়ে কথা বলা হল। তারপর বড় মাদ্রাসায় এলাম। এগারটায় মাদ্রাসা ছুটি হল। তখন সব মিলিয়ে বাইশ জন শিক্ষক একটা ঘরে বসে আমাদের কথা শুনলেন ও বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করলেন। তাশকিলে বেশ সাড়া পাওয়া গেল। একজন শিক্ষক জানালেন,

পাশের ওয়াক্তিয়া মসজিদে তিনি নামায পড়ান। আমরা যদি যোহরে ওখানে নামায পড়ি তবে তিনি যেয়ে এলাকার মানুষদের যোহরে মসজিদে জমা করবেন। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়! আমরা সবাই যোহরের নামায ঐ মসজিদে পড়লাম। নামায শেষে বয়ান হল, তারা এতই আন্তরিক যে, অন্ততঃ এক দিনের জন্য হলেও আমাদেরকে তারা ঐ মসজিদে থাকার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত এ এলাকা থেকে যাবার আগের দিন আমরা ঐ মসিজিদে যাব বলে কথা দিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখা সম্ভব হয়নি।

ছেলেরা বিকালে মাঠে ফুটবল খেলে। কিছু ছেলে আমাদের হয়ে আগেই ওখানে যেয়ে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের ওখানে যাওয়ার জন্য খবর পাঠাল। সুতরাং বিকালে উমুমী গাস্তে যাওয়ার পথে মাঠে যাওয়া হল এবং কথা হল। সব কিছু মিলিয়ে আজ বেশ আনন্দেই সময় কাটল। এদিকে পানিবাহি গাড়ী এলাকায় আসায় মসজিদ কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য প্রচুর পানি জমা করেছেন যেন গোসল করতে পারি। সেটাও বাড়তি আনন্দের কারণ হল। মসজিদের ইমাম মওলানা। জিবরানের আত্মীয়। মসজিদের তিনি অবৈতনিক ইমাম। মাদ্রাসার প্রধান হিসাবে তিনি ৫২,০০০/-(বাহান্ন হাজার) রিয়েল মানে আমাদের ১৭,০০০/-(সতের হাজার) টাকা বেতন পান। এতেই সংসার চলে যায়। তিনি ছাড়াও এখানে আরও তিন/চার জন শিক্ষক ও কয়েকজন স্থানীয় মানুষ চার/পাঁচ মাস পর ছুটি হলে সেই সুযোগে চিল্লায় বাংলাদেশে আসতে চাইলেন। পরপর দুই দিনই তারা যত বেশি সম্ভব আমাদের সঙ্গ দিলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে জানার প্রচেষ্টা চালালেন। আমির সাহেব কোরআন ও হাদিস থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে বয়ান করলেন ও এ মেহনত যে কত জরুরী এবং হুজুর (স.) এর জন্য কত পেরেশান ছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করলেন। এ ধরনের মেহনত তো দূরের কথা, কোরআন পাকে এ সম্পর্কীয় যে সমস্ত আয়াতে দাওয়াতের কথা বলা হয়েছে এটাও তাদের কাছে নূতন উপলব্ধি। তাদের কথ্য আরবী কিন্তু শুদ্ধ আরবীর মতো না। আমাদের শুদ্ধ আরবী বুঝতে তাদের সমস্যা হচ্ছিল বলে মনে হয়। তবুও কোন পক্ষেই আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। ইতোমধ্যে পরবর্তী সপ্তাহে যে এলাকায় যাওয়া হবে সেখানের দুই সাথী মাশোয়ারায় এসে আমাদের সঙ্গে ছয়দিন সময় লাগিয়ে আমাদের নিয়ে তাদের এলাকায় যাবেন বলে জানালেন। এর মধ্যে ভাই ইয়াহ্‌হিয়া বহুদিন আগে পাকিস্তানে সময় লাগিয়েছেন এবং জামহুরি ভাই দেশেই সময় লাগিয়েছেন। তারাই এ খবর আমাদের জানালেন এবং স্থানীয় ভাষাভাষিদের আমাদের কথা বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মসজিদ-ই নূর এ একই অবস্থা হল। এখানেও শিক্ষকরা খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসলেন। তারা গাস্তে আমাদের সঙ্গে তো জুড়লেনই অধিকন্তু স্থানীয়দের এই মেহনতের বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করলেন। আগের মাদ্রাসার শিক্ষক এবং এ এলাকার শিক্ষকরাও

খুব আগ্রহ নিয়ে কাজ করলেন। মাদ্রাসার ছাত্রদের একত্র করে দুই মাদ্রাসায় আমাদের দিয়ে বয়ান করালেন। সব কিছু মিলিয়ে বেশ ভালই লাগছিল।

মুরে মোরখাম বিরাট এলাকা জুরে অবস্থিত। সম্মুখের ছোট ছোট পাহাড়ের বেড়া ডিঙ্গালেই বিশাল সমভূমি চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এখানে প্রচুর কৃষি ও সবজি জমি। সব্জি জমিতে উৎপাদিত পানি সেচের মাধ্যমে ফসলের ফলন দেখবার মতো। টমেটুগুলো এতই সুন্দর ও মসৃণ যে মনে হয় টমেটুর গায়ে তেল মাখিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষেতের কোন টমেটুর একটু অংশ খারাপ বা দাগী হলে নিজেরাই সে টমেটুকে বাতিল করে দিচ্ছে। স্থানীয় সাথীরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে আপেলের চেয়েও সুন্দর টমেটু প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে আসেন। ফলে বাদ ফজর ও বাদ জুমা আমরা নিয়মিত প্রচুর টমেটু কেটে টুকরা করে লবন ও সরিষার তেল মাখিয়ে খেতাম। দার এল সোয়ারিয়া মসজিদেও একই অবস্থা চলল। এখান থেকে মূল মোরখাম পাহাড় খুব কাছে। ওখানে উঠলে সমগ্র ইয়ামেন ও তার পা ধুয়ে বয়ে যাওয়া সমুদ্র দেখা যায়। কিন্তু রাস্তা না থাকায় দূরুহ ছাগল চলা রাস্তা দিয়ে আমাদের পক্ষে উঠা সম্ভব হল না। অপেক্ষাকৃত তরুন হাজী রঞ্জু ও হাজী মিজান চেষ্টাও করলেন। কিন্তু কিছুটা উঠার পর ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। পাহাড়ী ছাগলের মতো লাফিয়ে উঠা তো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রায় সব এলাকায়ই বেশ কিছু তরুন ও কিছু সচ্ছল মুরুব্বীকে কাদের আসরে বসে থাকতে দেখেছি। এরা প্রায় সবাই সৌদি আরবে চাকুরী করে। তিন মাসের ছুটিতে দেশে এসেছে। মার্চের শেষে বা এপ্রিলে সৌদি আরবে ফিরে চলে যাবে। এছাড়া স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে দিনে দেখাই হত না বলতে গেলে। আশি বছরের আহমদ ভাইকেও বাদ ফজর গাধা নিয়ে মাঠে যেতে দেখেছি। পুরুষরাও অসম্ভব পারিশ্রমী। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে এক নাগারে কাজ করে। বিড়ি সিগারেট কাউকে খেতে দেখিনি। পাথরওয়ালা অনাবাদি জমি থেকে পাথর তুলে জমি চাষযোগ্য করা, পাথর দিয়ে ঐ জমির চারদিকে আল বাধা ও মাটি ফেলে বা কেটে তা সমান করা, সে জমি চাষ থেকে ফসল ফলানো পর্যন্ত যাবতীয় কাজ, বাড়ীঘর এর জন্য পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর বয়ে এনে বাড়ী বানানো ইত্যাদি সব কাজ পুরুষরাই করে। কোন একটা কৃষকের গায়ে চর্বি আছে অর্থাৎ আমাদের দেশের মতো থলথলে মোটা এমনটা দেখতে পাইনি। কারো কোন নালিশ নাই, ঝামেলা নাই, সমস্যা নাই। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। আর তাই অপরের পেছনে লাগার মতো সময় নাই। আমাদের মতো পরছিদ্রান্বেষীও নয়। সহজ সরল অনারম্বর অতিথি পাগল এই মানুষগুলো আমাদের মনের মধ্যে একটা গোপন ও গভীর ভালবাসার বস্তু হয়ে রইল। এখন পর্যন্ত এক বেলাও এমন হলনা যে তিন/চার/পাঁচ বাড়ী থেকে খাবার আসে নাই। আমরা শুধু শুধু গ্যাসের চুলা বয়ে বেড়াই। এক মসজিদ থেকে পরবর্তী মসজিদে নিয়ে যাওয়া বা দিয়ে আসাও তাদের দায়িত্বে। একদিন আমরা

নিজেরা গাড়ী ভাড়া করেছিলাম। কিন্তু সে ভাড়াও ওরা আমাদের দিতে দেননি। ড্রাইভারও তাদের দলে। এ এক আজব ভাল মানুষদের দেশের অনাস্বাদিত ও অপূর্ব ভালবাসার বন্যা। এ ঋণ আমরা কি শুধবার কথা ভাবতে পারি? তাই রহমানুর রাহিম আল্লাহর দরবারে এদের জন্য শুধু দু'হাত তুলি আর আফসোস করে বলি হায়! এ রকম গুণ কি আমাদের হতে পারে না?

মসজিদ-ই নূর এ আসার পূর্ব পর্যন্ত এদেশের ছেলেদের পানির ছোট বোতলের এক বোতল পানিতে অজু করতে দেখলে কেমন যেন কৃপন বলে মনে হত। আমাদের এক সাথীর তো এক বদনা পানিতেও অজু শেষ হত না। পানির প্রয়োজন হলে কাউকে বললেই পানি চলে আসত। ফলে, মনে তেমন কোন প্রশ্ন জাগেনি। গাড়ীতে আসার সময় পথের ধারে মাঝে মধ্যেই কুয়া চোখে পড়ত। কুয়াকে এরা বলে 'বীর' যেমন বীরে মাউন। সব সময়ই এসব কুয়ার ধারে গাধা নিয়ে মেয়েদের পানি নিতে দেখতাম। কোন কোন কুয়ায় অবশ্য একটা কপিকল থাকলেও কুয়ার চারধারে দাঁড়িয়ে মেয়েরা নিজের দড়ি ও ছোট কন্টেনার দিয়ে পানি তুলত। এটাই এখানে স্বাভাবিক মনে হত। মসজিদ-ই নূরের সামনেই একটা কুয়া আছে। দূরত্ব পঞ্চাশ/ষাট হাত হবে হয়ত। তিনদিকে গাছ গাছালীতে প্রায় ঢাকা। ঐ দিন ভোর বেলায় ফজরের নামায ও বয়ান শেষ করে বাইরে বের হতেই দেখি কুয়ার ধারে তিন/চারটা বাচ্চা মেয়ে পানি নিচ্ছে। তখনও চারদিক পুরা ফর্সা হয়নি। পানি তোলা দেখার জন্যই ওদিকে নজর দিলাম। বোরখা আবৃত ছোট্ট মেয়ে আট/দশ বছর হয়ত বয়স হবে। লম্বা দড়ির মাথায় কন্টেনার বাঁধা। সেটা কুয়ার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে দড়িধরে টানাটানি করল। তারপর বোধ হয় কন্টেনার ভর্তি হল। তখন টেনে তুলতে দেখলাম। নিচের হাত একটানে মাথার উপরে টান করে তুলে ধরে অপর হাতে হাটুর নিচের দড়ি ধরছে এবং একই ভাবে ঐ হাত উঠাচ্ছে। এককেবারে তিন/সাড়ে তিন হাত দড়িসহ পানি উঠছে। বেখেয়ালেই বোধহয় গুনছিলাম। অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম এক কন্টেনার (এক বদনার একটু বেশি) পানি তুলতে তাকে ষোল বার হাত উঠাতে হল। এর অর্থ বাচ্চাটি ওর হাতে প্রায় আটচল্লিশ/পঞ্চাশ হাত নিচে থেকে পানি তুলছে। এর অর্থ বড়দের হাতের প্রায় চল্লিশ হাত গভীর কুয়া থেকে ওকে অজুর জন্য এক কন্টেনার পানি তুলতে হচ্ছে। অথচ আমরা প্রায় বাংলাদেশের মতই ইচ্ছেমত পানি ব্যবহার করছি সবসময়। কেমন যেন নিজেকে হৃদয়হীন পাষন্ড ও অমানুষ বলে মনে হল। এদের এই কঠিন পরিশ্রমের পানি খরচ করার সময় একবারও এ কথা মনে হয়নি। মনটা খুব ছোট হয়ে গেল, নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। মনে মনে স্থির করলাম, এখন থেকে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব এ রকম পানির অপচয় যেন না করি। চিন্তা করে দেখলাম, এই পানি নিয়ে মেয়েগুলো তাদের বাড়ী যাবে– জানিনা তাদের বাড়ী কত দূরে। তারপরও যদি কোন কারণে কেউ হঠাৎ কুয়ার মধ্যে পড়ে যায় তবে

কেউ কোন সাহায্য করার পূর্বেই মেয়েটি মারা যাবে। পরে সাথীদের কাছে এ ব্যাপারে মসজিদে কথা তুলতেই শুনলাম, কিছুদিন আগেই কাছের এক কুয়ায় দুইটা মেয়ে একসঙ্গে কুয়ার ভেতরে পড়ে মারা গেছে। কুয়ার পাড় গুলো মাটির সমান অথবা এক হাত উঁচা, পাড়ের উপর দাঁড়িয়েই পানি তুলতে হয়। মনটা বড় বিষন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি করার আছে!

মুর এ মুরখাম এর পাহাড়ী কন্যার দেশে। আল-খারাজ মসজিদ থেকে আমরা এর পরে মুয়াররাস যাব আবার মরুভূমি কন্যার দেশে। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন ভাই আহমদ ছাবেত। দুপুরের আগেই গাড়ী নিয়ে হাজির, দুইশত/দুইশত পঞ্চাশ গজ দূরত্ব কিন্তু পাহাড়ে উঠানামায় আমাদের কষ্ট হবে ভেবে নিজেই গাড়ী চালিয়ে চলে এসেছেন। নামায শেষে আমরাও আর দেরী করলাম না। বেশ সচ্ছল মানুষ, দুই/তিনটা ট্রাক ও পিকআপ আছে। বাড়ীতে নিজস্ব পাম্পের সাহায্যে ট্যাপ সিস্টেম, এমন কি হাত ধোওয়ার বেসিনও আছে। বেশ কিছু মেহমান ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। সুতরাং দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ নেওয়া হল। আমির সাহেব আরবীতে কথা বলতে শুরু করেছেন হঠাৎ দেখি মাদ্রাসার শিক্ষক ভাই আলী। তিনি মোটামুটি ইংরেজীতে কথা চালিয়ে নিতে পারেন। আমরা দুজন একসাথে কথা বলছিলাম। প্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎ আলী ভাই প্রশ্ন করলেন, ইয়েমেন এতবড় দেশ, সেখানে মাত্র ছয়জন মানুষ আপনারা। কতটুকু কি করবেন? হেসে বললাম, ঘুমন্ত সিংহদের জেগে উঠার জন্য ছোট্ট একটা নেংটি ইদুরই যথেষ্ট। যদি একটা সিংহও জাগাতে পারি তবে তার ডাকে অন্য সিংহদের জেগে উঠা কি খুব অসম্ভব? আপনারা হুজুর (স.) এর সাহাবাদের বংশধর। আপনাদের এক ইয়েমেনী ওলী-এ-কামেল হযরত শাহজালাল (রহ.) এ দেশের হাজরা মাউথ থেকে যেয়ে এক সময় বাংলাদেশকে জাগিয়েছেন। তিনি সিলেট শহরে ঘুমিয়ে আছেন। আর সিলেটের অত্যাচারী রাজা গৌড় গোবিন্দ নিঃশেষে মাটিতে মিশে গেলেও হযরত শাহজালাল (রহ.) এর আযানের সুর লহরী শুনে আংশিকভাবে মাটিতে বসে যাওয়া রাজার রাজবাড়ী কালের সাক্ষী হয়ে এখনও ভগ্নদশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং আবার আপনারা যদি দ্বীনের স্বার্থে এবং নিজেদের রোজ কেয়ামতের ভয়াবহ প্রশ্নের জবাব থেকে বাঁচাতে এখন থেকেই দাওয়াতের মেহনত শুরু করেন তবে গোটা ইয়েমেনের মানুষদের ঘুম থেকে জেগে উঠতে খুব সময় লাগবে কি? আসলে এ গুলি আপনার যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি হিসাবে বললাম। প্রকৃত সত্য হল, সব কিছুর নিয়ন্ত্রক হলেন আল্লাহ পাক। তিনি কি দিয়ে কিভাবে কি করবেন তা তিনি শুধুই নিজে জানেন। আমরা আমাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। ফলাফল আল্লাহর হাতে। তিনি সর্ব শক্তিমান। ফয়সালারও তিনিই মালিক। সুতরাং এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কি প্রয়োজন?

পাহাড়ী কন্যার দেশে আজকে আমাদের অবস্থানের শেষ দিন। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। অটল গাম্ভির্য নিয়ে নিরব, নিথর, নিশ্চুপ পাহাড় গুলো শব্দহীন ভাষায় কেমন করে যে এই অল্প কয়েকদিনেই আমাদের ভালবাসার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে তা আগে বুঝিনি। ছেড়ে যাবার আগে তাই বিভিন্ন পাহাড়ের মাথার উপরের বাড়ীঘর সহ 'ভাল কিছু মনে রাখার মতো স্মৃতি' পেতে মন চাইছিল। এ যেন চুলের কাঁটা ব্যাগে রেখে ভালবাসার জনকে মনে রাখার আন্তরিক অথচ অক্ষম প্রচেষ্টা। ছাবেত ভাইকে কথাটি বলতেই লাফিয়ে উঠে গাড়ী চালু করে বললেন, শিগগীর উঠে পড়ুন। সময় খুব কম। 'এ যেন উঠ্ ছুড়ি তোর বিয়ে' এর মত অবস্থা। ভাল করে কিছু বোঝার আগেই তরতর করে গাড়ী ছুটে চলল পাহাড়ী পথ দিয়ে। খুব পাকা ড্রাইভার। দীর্ঘ জীবন পাহাড়ী পথে গাড়ী চালিয়ে অভ্যস্ত। তাই কঠিন পথের বাঁকগুলোও অবলিলাক্রমে সাবলিলভাবে পার হচ্ছিলেন। তার এক ছেলে আহমদ আমাদের সঙ্গে আসছিল। বয়স মাত্র দশ বৎসর। সে এখনই বাড়ীর ট্রাক চালিয়ে অভ্যস্তই শুধু নয় বরং বেশিরভাগ সময় সেই-ই ট্রাক চালায়। ভাবতেই অবাক লাগে।

পাহাড়ের বন্ধুর পথ শেষ হতেই পাকা রাস্তা। বাঁয়ে চলে গেছে আদন অর্থাৎ এডেন বন্দরের দিকে আর ডানের রাস্তা গেছে কিরখাম এর চূড়া বুয়ারা এর দিকে। এই পাহাড়ের পাশাপাশি প্রায় সমান উঁচু দুইটা চূড়ার একটার উপর নাফরা টেলিফোন ও মোবাইল টাওয়ারসহ সুন্দর ছোট খাট একটা শহর। শহরে ঢোকার আগে পাকা রাস্তা শুরু হয়েছে। ঐখানে একটা বাঁক খুব কঠিন। ছাবেত ভাইও খুব ধীরে ধীরে মোড়টা পার হলেন। আমি গাড়ীর বাম দিকের জানালার ধারে বসে দেখলাম, ধার থেকে ছোট ছোট নুরী পাথর ঝুর ঝুর করে নিচের দিকে কিছুটা ঝড়ে পড়ল। এদেশে গাড়ী চলে রাস্তার ডানদিক দিয়ে। ফোর হুইল গাড়ী তবুও কেমন যেন শিহরণ খেলে গেল শরীরের ভেতরে।

পরিচ্ছন্ন শহর, ঢোকার মুখেই মস্তবড় 'মাদ্রাসা খাওলা' এবং তার দু'পাশে এবং কিছুটা উপরে বিভিন্ন কর্মচারী ও স্থানীয় মানুষদের বসবাস। শহরের নাম কুআইদিনা। ঢুকার মুখেই বাজার এবং তার বেশিরভাগ অংশেই জমজমাট কাদ বিক্রির ব্যবস্থা। তার পাশেই একটা কৃত্তিম পুকুর– নিচে ও চারপাশে পাকা করা গভীর একটা সুইমিং পুলের মতো। তলায় সামান্য পানি তবু সবাই আমাদের ওখানে 'মুইয়া' মানে পানি দেখাতে নিয়ে যেতে চায়। তাদের প্রাণহীন দেশে এটা একটা আশ্চর্য বস্তু। পাশের ছোট পাহাড়েই সব ধরনের অস্ত্র বিক্রির বাজার 'খামিছ'। আমাদের দেশের যে কোন হাট বাজারে যেভাবে দা বটি ইত্যাদি বিক্রি হয় ঐ রকমই এই বাজারে এ কে-৪৭ সহ যে কোন অস্ত্র বিক্রি হয়। এদেশে কোন লাইসেন্স লাগে না। যে কেউ যে কোন অস্ত্র কিনতে পারে। অবশ্য ট্যাংক ও কামান বিক্রি হয় কিনা তা জানি না! সকাল থেকে এগার/বারটা পর্যন্ত বাজার চলে। আমাদের আসতে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ায় বাজারটা দেখা হল না।

পাশের আর একটা পাহাড়ের একদম চূড়ায় একটা অদ্ভুদ প্রাচীর ঘেরা বড় জায়গা সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল। সাবেত ভাইও অবাক। এখানে প্রাচীরও তেমন জরুরী কিছু না। কিন্তু এত বড় বিরাট এলাকা ঘিরে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে এবং তার উপরে কাঁটা তারের ফেন্সিং। নিষিদ্ধ বস্তু মন টানে বেশি তাই ছাবেত ভাই নিজেই প্রায় খাড়া ঐ কোন রকমে তৈরি করা খারাপ রাস্তা দিয়েই পাহাড়ের উপরে উঠলেন। এখন পর্যন্ত শুধু প্রাচীর হয়েছে। গেটের কাজ চলছে। আনুমানিক পাঁচ/সাত একর জায়গা প্রায় সমতল করা হয়েছে। এদিকের প্রান্তে একাধিক জায়গায় গভীর করে দেড় ফুট বোর (ফুটা) করে নিচের গঠনশৈলী পরীক্ষা করা হয়েছে বলে মনে হল। তারপরে যা দেখলাম তা মনে রাখার মতো। প্রাচীরের ধার দিয়ে নিচের দিকে তাকালেই চারদিকের গভীর খাদসহ সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ধারে চিকন করে যে সব ক্ষেত তৈরি করা হয়েছে তাকে দেখে চমৎকার ভাবে তৈরি ও সবুজ কার্পেটে মোড়া চওড়া সিঁড়ির মতো লাগছিল। মনে হল আমরা গিরি কন্যার অন্দর মহলে এসে গেছি। ঐ সব সিঁড়ির কার্পেটের উপরে রাতুল পায়ে আলতো ছোঁয়ায় ছন্দে ছন্দে হিল্লোল তুলে সে এখানে উঠে এসে এলোকেশী মেঘ সখীদের সঙ্গে অবসর সময় কাটায়। আমাদের মতো অনাহুত অতিথিদের দেখে পাশের কোন পর্দা ঘেরা ঝরোকায় সরে গেছে। আমরা চলে গেলেই হয়ত আবার এসে ব্যালকনীর কোনা ধরে আকাশের মেঘ সাথীদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। একটু দূরে আরো একটা পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট আরো একটা শহর চোখে পড়ল। শুনলাম শহরটির নাম 'ল্যামর'। কুআইদিনা থেকে উত্তর পূর্বে অবস্থিত। পাকা রাস্তা এঁকে বেঁকে ঐ দিকে চলে গেছে। এত উঁচাতেও গাড়ীর কোন কমতি নেই। বাজারের উপর অনেক গাড়ীর ভিড়ে দুইটা পানিবাহি ট্যাংকার দাঁড়িয়ে ছিল। চালু হয়ে আমাদের সামনে দিয়ে নিচের দিকে রওয়ানা হল। অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করলাম, পানি ভরা এত হেভি ট্রাকটি চালাচ্ছে দশ/বার বৎসর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে। এই পানি ভরা ট্যাংকার নিয়ে এবং দূরহ ও বিপদ সংকুল এসব বাঁক এবং অসংখ্য খারাই উৎরাই পার হয়ে এই বাচ্চা ছেলেটা কেমন করে নিচে যাবে ভেবে আঁৎকে উঠলাম। কিন্তু সিংহের বাচ্চা তো সিংহই হয়। অপর ট্যাংকারের হুইলে যে বসে আছে সেও বাচ্চা তবে দুই/এক বছরের বড়। বুঝলাম, ছোট বাচ্চারা যত সাহসী ও নির্ভিক হয় বড়রা হয়ত সংসারের কথা ভেবে অতটা সাহস করেনা অথবা এটাই হয়ত এখানকার নিয়ম। তবে মনের খুঁৎখুতি কোন ভাবেই গেলনা। ছোট্ট আহমদ তো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সেও তো ট্রাকই চালায়! তবে? আমি কি নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার করার চেষ্টা করছি?

এদেশে বাবলা গাছ দুই রকমের। একটা আমাদের দেশের মতো বেশ বড় কাঁটাওয়ালা। অপরটি অদ্ভুৎ সবুজ পাতাওয়ালা ও ছোট কাঁটাওয়ালা যেগুলি জন্মের সময় থেকেই চারদিকে ডাল বিছিয়ে মেলে রাখা ছাতার মতো বেড়ে

উঠে। এ গুলিকে এরা সিডর বলে এবং এই বাবলাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। পাহাড়ের উপরে অবশ্য সিডর বেশি নাই কিন্তু হলুদ ফুলওয়ালা এক ধরনের বাবলা গাছ অনেক। হঠাৎ এক জায়গায় প্রচুর সাদা ফুলওয়ালা গাছ দেখা গেল। কাছে যেয়ে দেখি এগুলোও বাবলা, তবে ফুল হলুদের বদলে সাদা এবং পাতাও ঠিক সবুজ না বরং হালকা খয়েরী রং এর। বেশ কিছু আদন ফুল গাছও দেখলাম। সবগুলোই হালকা গোলাপী ফুলে ঢাকা। শুধু একটা গাছ দেখলাম যার ফুল সাদা। কেন তা কে বলবে?

নিচে নামার সময় মিষ্টি মনটা তেতো হয়ে গেল। উপর থেকে যে সব সবুজ ক্ষেতকে সবুজ কার্পেট মোড়া চওড়া সিড়ির মতো মনে হয়েছিল এখন দেখলাম, সেগুলো শুধুই কাদের ক্ষেত। একমুঠো কাদের দাম ১,০০০/২,০০০ (এক হাজার/দুই হাজার) রিয়েল। এই নেশা বেচে এরা অঢেল পয়সা কামায়। আর এসব পাহাড়ে মূলতঃ শুধুই কাদের চাষ হয়। কলা বাগান, আম বাগান ইত্যাদিও আছে, তবে তা তেমন উল্লেখ করার মতো নয়। রাত্রে মসজিদে অনেকেই বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাদের ছেড়ে যাচ্ছি জন্য মনোবেদনার কথা জানালেন। নতুন করে জামাত পাঠাতে বললেন। সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে আসবেন তাও অনেকেই বললেন। কেমন একটা বেদনা মাখা ভালবাসায় মনটা আপ্লুত হল। তারপর এক সময় রাত পেরিয়ে ভোর হল। কুয়াশার মতো হালকা আঁধারে পাহাড় ও আশেপাশের এলাকা ডুবে আছে। পাহাড়ী কন্যা কি হালকা ধূসর ওড়না দিয়ে বেদনায় মুখ ঢেকে আছে? নাকি অভিমানে মুখ আঁচলে ঢেকে মনের বেদনাকে লুকাতে চাচ্ছে? কিংবা হয়ত এসব কিছুই না, শুধুই আমার মনের রং তুলির আবেগমুখর অভিব্যক্তি। তবে যাই হোক না কেন, প্রকৃত সত্য এই যে, বিদায়ের সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। মনে মনে ওদের দিকে তাকিয়ে আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে বললাম,

বিদায় হে মোর চারদিকে থাকা মৌন নিথর গিরি,
উপায় কি বল, যেতে হবে আজই তোমাদের মায়া ছাড়ি।

পাহাড়ী রাজার রাজধানীতে

মরু রাজ্য মুয়াররাস থেকে এলাকার সাথী জামহুরী ভাই আমাদের সঙ্গে সময় লাগাচ্ছিলেন আমাদের নিয়ে যাবেন বলে। সকাল থেকেই জামহুরি ভাই খুব খুশি। বাড়ীতে মোবাইল করলেন। আমাদের সামানা গুছাতে হাত লাগালেন এবং বারবার বাইরে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু বেশি দেরী হল না। কলি যুগের পুষ্পক রথ টয়োটা ২৭০০ পিকআপ এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাস্তা শেষে আমরা আবার চললাম দশ দিনের সফরে মরু রাজ্য মুরাররাস এর দিকে। মসজিদের নাম মুয়াররাস মহল্লে বিচ্ছিন, এখান থেকে মাত্র এক ঘন্টার পথ। পাহাড়ী ঢাল পেরিয়ে প্রথমে আদন (এডেন) গামী রাস্তায় এসে কিছুদূর যাওয়ার পরে বাঁয়ে মোড় এবং তার অল্প কিছুদূর এগোলেই বড় রাস্তার কাছেই মসজিদ। গাড়ী থামতেই জামহুরী ভাই নেমেই প্রায় দৌড়ে কাছেই নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন এবং আমাদের হতবাক ও হতবুদ্ধি করে দিয়ে একটা বড় জামবাটিতে করে নয়টা একদম গাছপাকা সিন্দুরে আম নিয়ে হাজির। এটা ফাল্গুন মাস। আমাদের দেশে আম করালী খাওয়ার বয়েস এখন আমের। অথচ যা চোখে দেখছি, যার স্পর্শ পাচ্ছি তা তো কল্পনা নয়, একদম রুঢ় বাস্তব। মুখের খুশির হাসি কানে যেয়ে ঠেকেছিল কিনা তা দেখা সম্ভব হয়নি তবে মন যে ময়ূরের মতো পেখম তুলে নাঁচ শুরু করেছিল তা আর কাউকে বলতে হয়নি। মাশোয়ারা শেষ করে তালিম শুরুর আগে যে পনর মিনিট সময় হাতে ছিল আম খাওয়ার জন্য সেটাকেই কাজে লাগাতে আমীর সাহেবসহ সবাই একমত হলেন। সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ।

মসজিদ থেকে মাত্র দুইশত পঞ্চাশ/তিনশত গজ দূরে বাজার। এখানেও হাটের দিনে অস্ত্র বিক্রি হয়। আগামীকাল হাট আছে। তবে আজকে সব স্থায়ী/অস্থায়ী দোকানই খোলা। প্রায় দুই ঘন্টা মানে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত গাস্ত হল। সাইফুল ভাই আবার কাবুলী সেট পড়েন। ফলে কেউ কেউ ভাবছিল, এটা বোধহয় পাকিস্তানী জামাত। কিন্তু শফিউল ইসলাম ছিলেন মুতাকাল্লেম অর্থাৎ কথা বলার দায়িত্বে। তিনি তা মানবেন কেন? সুতরাং তাদেরকে প্রথমেই জানানো হল, নাহনু ছিত্তানফর মিন বাংলাদেশ, এটা বিশুদ্ধ বাংলাদেশী জামাত। সন্ধ্যার বয়ানে অনেক সাথী জুড়লেন। তখনও তেমন ভাবে গরম শুরু হয়নি এ কারণে রাতেও অসুবিধা হলনা। পরের দিন প্রায় এগারটার দিকে আমাদের তালিমের সময় অন্য এক গাড়ীতে চড়ে দুইজন সাথী এলেন। বেশ ক্লান্ত। আমাদের খোঁজে মোরখাম এর পাহাড়ী এলাকার বিভিন্ন মসজিদ ঘুরে তারপর মুয়াররাস এসেছেন। শুনে খুব ভাল লাগল। তাদের একজনের নাম আব্দুল্লাহ

আলী, খুব পুরাতন সাথী। দুই বার বাংলাদেশে, দুই বার ভারতে ও দুই বার পাকিস্তানে সময় লাগিয়েছেন। তাড়াতাড়ি উনাদের নাস্তার ব্যবস্থা করে আমরা তালিমে ফিরে গেলাম আর আমির সাহেব মেহমানদের নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি উঠে এলেন আমাদের কাছে– জরুরী আলোচনা করতে।

ইংরেজীতে ছোট বেলায় পড়েছিলাম, Man proposes but god disposes অর্থাৎ মানুষ ভাবে এক রকম আর আল্লাহ করেন অন্যরকম। এখানেও সেই একই ব্যাপার। ভাই আলী হাসান নাজ্জারীর কাছে তারা শুনেছেন, একটা বাংলাদেশী জামাত এখন পাশের পাহাড় মোরখামে আছে। খুব শীঘ্রই তারা হুদাইদা ফিরে যাবে। শুনে সঙ্গে সঙ্গেই আব্দুল্লাহ আলী ভাই ছুটেছেন হুদাইদাতে। তাদের ঐ পাহাড়ী এলাকায় এ পর্যন্ত কোন বিদেশী জামাতের রোখ হয়নি, সুতরাং এই সুযোগে এই জামাতকেই তারা বরকত হিসাবে চান। এদিকে মুয়াররাস এর সাথীরা আগেই মার্কাজে মোবাইল করে ছিলেন, কিন্তু মরু এলাকায় এর আগেই আমাদের কুড়ি দিন মেহনত হয়ে গেছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে ভাই আব্দুল্লাহ আলী খুব পুরাতন ও কর্মী সাথী। নিজে হুদাইদাতে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ফলে তার প্রচেষ্টাই সফল হল। আমাদের তখনও সত্তর দিন সময় বাঁকী আছে। আলী ভাইরা পুরা সময়ের জন্যই আমাদের জামাতকে তাদের এলাকায় চাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত মুরুব্বীরা চল্লিশ দিনের জন্য আমাদের রোখকে মুয়াররাস এর পরিবর্তে যে সব পাহাড়ী এলাকায় এখনও কোন বিদেশী জামাতের পা পড়েনি তেমনি এক পাহাড়ী এলাকা নাহবীদ এর জন্য রোখ নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। আলী ভাই আমাদের এখন তাদের এলাকায় নিয়ে যেতে গাড়ীসহ এসে হাজির। আমরা হুদাইদাতে ফোন করলাম। মার্কাজের ফয়সালা ভাই সালেহ মকবীল বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করলেন। ঐ এলাকায় কোনদিন কোন বিদেশী জামাত যায়নি। আমাদের মেহনত যদি আল্লাহ কবুল করেন সেই আশায় আমাদের ওখানে যেতে তিনিও বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। জামহুরি ভাই ছিলেন না, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে হাজির। বিষয়টি শুনে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। জামহুরি ভাইরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সন্ধ্যায় মুয়াররাস এর সব মুরুব্বী এখানে এসে মাশোয়ারা করে পরবর্তী মসজিদ সমূহ ঠিক করবেন। এছাড়া এলাকার সব বাড়ীতেই খবর দেওয়া হয়েছে বাদ মাগরিব বয়ানে উপস্থিত হতে। সুতরাং একটা নাজুক অবস্থা তৈরি হল। সবাই আবার মাশোয়ারায় বসলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আলী ভাইরা এশার নামায পর্যন্ত দেরী করবেন এবং জামাত শেষে আমরা উনাদের সঙ্গে নাহবীদ এ যাব। জামহুরি ভাইরা শেষ চেষ্টা হিসাবে হুদাইদাতেও যোগাযোগ করলেন কিন্তু লাভ হলনা। ফলে আবার মরু কন্যার বদলে গীরি রাজ্যে যাওয়াই স্থির হল। নামায শেষে রাত্রের খাবার

আলী, খুব পুরাতন সাথী। দুই বার বাংলাদেশে, দুই বার ভারতে ও দুই বার পাকিস্তানে সময় লাগিয়েছেন। তাড়াতাড়ি উনাদের নাস্তার ব্যবস্থা করে আমরা তালিমে ফিরে গেলাম আর আমির সাহেব মেহমানদের নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি উঠে এলেন আমাদের কাছে– জরুরী আলোচনা করতে।

ইংরেজীতে ছোট বেলায় পড়েছিলাম, Man proposes but god disposes অর্থাৎ মানুষ ভাবে এক রকম আর আল্লাহ্ করেন অন্যরকম। এখানেও সেই একই ব্যাপার। ভাই আলী হাসান নাজ্জারীর কাছে তারা শুনেছেন, একটা বাংলাদেশী জামাত এখন পাশের পাহাড় মোরখামে আছে। খুব শীঘ্রই তারা হুদাইদা ফিরে যাবে। শুনে সঙ্গে সঙ্গেই আব্দুল্লাহ আলী ভাই ছুটেছেন হুদাইদাতে। তাদের ঐ পাহাড়ী এলাকায় এ পর্যন্ত কোন বিদেশী জামাতের রোখ হয়নি, সুতরাং এই সুযোগে এই জামাতকেই তারা বরকত হিসাবে চান। এদিকে মুয়াররাস এর সাথীরা আগেই মার্কাজে মোবাইল করে ছিলেন, কিন্তু মরু এলাকায় এর আগেই আমাদের কুড়ি দিন মেহনত হয়ে গেছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে ভাই আব্দুল্লাহ আলী খুব পুরাতন ও কর্মী সাথী। নিজে হুদাইদাতে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ফলে তার প্রচেষ্টাই সফল হল। আমাদের তখনও সত্তর দিন সময় বাঁকী আছে। আলী ভাইরা পুরা সময়ের জন্যই আমাদের জামাতকে তাদের এলাকায় চাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত মুরুব্বীরা চল্লিশ দিনের জন্য আমাদের রোখকে মুয়াররাস এর পরিবর্তে যে সব পাহাড়ী এলাকায় এখনও কোন বিদেশী জামাতের পা পড়েনি তেমনি এক পাহাড়ী এলাকা নাহবীদ এর জন্য রোখ নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। আলী ভাই আমাদের এখন তাদের এলাকায় নিয়ে যেতে গাড়ীসহ এসে হাজির। আমরা হুদাইদাতে ফোন করলাম। মার্কাজের ফয়সালা ভাই সালেহ্ মকবীল বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করলেন। ঐ এলাকায় কোনদিন কোন বিদেশী জামাত যায়নি। আমাদের মেহনত যদি আল্লাহ্ কবুল করেন সেই আশায় আমাদের ওখানে যেতে তিনিও বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। জামহুরি ভাই ছিলেন না, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে হাজির। বিষয়টি শুনে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। জামহুরি ভাইরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সন্ধ্যায় মুয়াররাস এর সব মুরুব্বী এখানে এসে মাশোয়ারা করে পরবর্তী মসজিদ সমূহ ঠিক করবেন। এছাড়া এলাকার সব বাড়ীতেই খবর দেওয়া হয়েছে বাদ মাগরিব বয়ানে উপস্থিত হতে। সুতরাং একটা নাজুক অবস্থা তৈরি হল। সবাই আবার মাশোয়ারায় বসলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আলী ভাইরা এশার নামায পর্যন্ত দেরী করবেন এবং জামাত শেষে আমরা উনাদের সঙ্গে নাহবীদ এ যাব। জামহুরি ভাইরা শেষ চেষ্টা হিসাবে হুদাইদাতেও যোগাযোগ করলেন কিন্তু লাভ হলনা। ফলে আবার মরু কন্যার বদলে গীরি রাজ্যে যাওয়াই স্থির হল। নামায শেষে রাত্রের খাবার

তিনশটি। সব সুদানী আমের কলম। গোড়ার দিকের আম-এ রং ধরেছে আর উপরে তখনও ছোট ছোট করালী। কিছু কিছু গাছে একই সঙ্গে মুকুলও দেখলাম। প্রায় গাছেরই নিচের দিকের আম মাটি ছোঁয়া অথবা প্রায় ছোঁয়া অবস্থায় ঝুলে আছে। গাছ এমনভাবে লাগানো হয়েছে যে, জোরা চাষ করতে কোন অসুবিধা হয় না। এছাড়া বড় বেগুন, টমেটু, মেহেদীর ক্ষেত, কলার বাগান ইত্যাদি আছে, খেজুর গাছে ফুল এসেছে। গাছের তলায় ঝড়ে পড়া আম পড়ে আছে অনেক কিন্তু কেউ নেয় না। চমৎকার নধর কান্তি তেল চোয়ানো বড় এক বালতি বেগুন হুরাইরা ভাই ঝটপট তুলে ফেললেন আমাদের জন্য। এছাড়াও সঙ্গে দিতে চাইলেন এক বাক্স টমেটু। আমরা এগুলো নিয়ে কি করব? কোথায়ও তো রান্না করার সুযোগ পাইনা। তাই বাধ্য হয়েই আসার সময় সব রেখে এসে তার মন খারাপ করাতে বাধ্য হলাম। তবু রাতে একটা পলিথিনে চারটা বড় বেগুন পেলাম সামানা নামাতে যেয়ে গাড়ীর এক কোনায়। ভালবাসার অকৃত্রিম ছোঁয়া মাখানো বেগুন। দেখা যাক কি করা যায়। ছয় জনের জন্য গাছ পাকা আমও বারটা দিতে ভুল হয়নি। অদ্ভুৎ আন্তরিকতা।

আকাশ পাহাড় জমিনকে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে প্রায় পূর্ণ চাঁদ উঠে এসেছে মাথার উপরে। কাল সকালে এখান থেকে অন্য মসজিদে চলে যাব, সুতরাং আব্দুল্লাহ আলী ভাইসহ সবাই বাইরের বৃষ্টির পানি জমা রাখার জন্য তৈরি বিরাট কুয়ার পাকা ছাদের উপর বসে গল্প করছিলাম। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তিনি ভারত সফর করেছিলেন। সে সময় মওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)এর সঙ্গে তারা দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তার বয়ানও শুনেছেন। সে সম্পর্কেও অনেক স্মৃতি কথা শুনালেন। অদ্ভুৎ ভালো মানুষ। এক পর্যায়ে তিনি আমাদের সঙ্গে পরবর্তী সবগুলো মসজিদেই নিজে তাঁর নিজস্ব ল্যাণ্ড রোভার গাড়ী নিয়েই সময় লাগাবেন বলে জানালেন। তার মুখে শুনলাম, মওলানা নদভী তাদেরকে বলেছিলেন দায়ীর চরিত্র হবে উটের মতো। সে গন্তব্যে পৌছার পূর্বে কোনভাবেই তার রোখ বদলাবে না। উটের মতো পিঠে খাবার থাকুক না থাকুক, সেদিকে না তাকিয়ে চলতেই থাকে এবং গন্তব্যে না পৌছানো পর্যন্ত থামবে না। মনে রাখতে হবে যে, দায়ীকে আল্লাহ কখনও ভুখা রাখেন না যেমন মালিক তার উটকে কখনও ভুখা রেখে কষ্ট দেন না। কড়া নজরে ও যত্নে রাখেন।

আমাদের এবারের গন্তব্য মসজিদ আল মাগারেবী এবং এখানেও দুই দিন থাকার কথা। এ পাহাড় আরো অনেক উঁচুতে। রাস্তা খুবই খারাপ। আগে নাকি আরো বেশি খারাপ ছিল। পরে এলাকাবাসী নিজেরা দশ লাখ রিয়েল চাঁদা তুলে নূতন এই রাস্তা করেছেন। অসংখ্য পাথর রাস্তার উপরে। সব ঠিক করতে হয়ত আরো দশ/বার বছর লাগবে। টাকাও লাগবে অনেক। সবই নিজেদের গরজে

এবং নিজেদের টাকায় করতে হবে। পাকা সরকারী রাস্তা পর্যন্ত যেতে তাদের সম্মুখে এছাড়া আর কোন বিকল্প নাই। পাললিক শিলার স্তর বিভিন্নভাবে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মধ্যে বেশ কিছু পাথর ও মাটি বগুড়ার মাটির মতো লাল রং এর। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রং এর পাথর দেখা যাচ্ছে। অবশেষে পাকা রাস্তা দিয়ে আল মাগারেব এর এলাকায় পৌঁছালাম। মাগারেবে অসংখ্য পাথরের ঘর বাড়ী, একটার উপর আরেকটি পাথর দিয়ে সাজিয়ে এসব বাড়ী তৈরি। মসজিদের আশে পাশে সর্বত্রই অনেক গুলো দোতলা বাড়ী। আধুনিক বাড়ীও তৈরি হচ্ছে। মসজিদে যেতে অনেক পাহাড় এবং তার চেয়েও প্রচুর বাঁক পার হতে হল। সবশেষে বাজার এবং অবশেষে মসজিদ।

সব এলাকার পাহাড়েই সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটার নাম পানি যার অপর পার্থিব নাম জীবন। পানির কোন সরবরাহ এসব পাহাড়ী কোন এলাকায় নাই। তবে এখানের স্থানীয় প্রচেষ্টা বেশ কিছুটা সহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সামনেই দশ/পনর হাত চওড়া ও বেশ গভীর কুয়া বানানো আছে। বর্ষাকালের বৃষ্টির পানি পাকা ড্রেনের সাহায্যে এ সব কুয়ার ভেতরে জমা করা হয়। এর ফলে বেশ কিছুদিন সাধারণ কাজে ব্যবহারের পানি এসব কুয়া থেকে পাওয়া যায়। মসজিদের কুয়ার পানি দেখলাম বেশ টলমলে পরিস্কার এবং এখনও বহুদিন অজুর কাজ চলবে। সবাই প্রায় মসজিদে এসে অজু করছে। লোহার ঢাকনি দিয়ে কুয়ার মুখ বন্ধ করা– তালা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। প্রায় সব পাহাড়েই পানির সরবরাহ করার মোটা ও চিকন পাইপ টানা আছে বিস্তৃত ভাবে। কিন্তু পানির সরবরাহ নেই কোন পাইপেই। মাদ্রাসায় এগারটায় ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে বয়ান হল। এরা আমাদের যেতে দিতে চায় না– আরও থাকার জন্য অনুরোধ করে বারবার। যে পাহাড়ে আমরা আছি এই পাহাড়টি দুই হাজার মিটার উঁচু বলে মাদ্রাসার দেওয়ালে টাঙ্গানো ম্যাপ দেখে শিক্ষকরা বললেন। সামনে আরো উঁচু পাহাড়ে যাওয়ার কথা আছে। এখানে ফ্যান ছাড়াই রাত্রে বেশ ঠান্ডা লাগছে। ফ্যানের নিচে ছাড়া যারা ঘুমাতে পারেন না তারাও দেখলাম রাত্রে চাদর গায়ে দিয়েছেন। এর আগে হোফাস মসজিদের কাছে ছোট ছোট টুনটুনি পাখি দেখেছিলাম। আমাদের টুনটুনির প্রায় অর্ধেক। এখানে প্রায় কাল রং এর ভাত শালিক দেখলাম অনেক। লেজটা একটু বড় এবং পাখার উপরে একটা করে বড় পালক ধূসর সাদা যা লেজ পর্যন্ত লম্বা। এখানে কাক দেখলাম চিলের মতো পাখা মেলে বাতাসে দীর্ঘ সময় ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রথমে চিল বলে ভুল করেছিলাম। অনেক পরে যখন পাশের এক দোতলা বাড়ীর কার্নিসে বসল তখন নিঃসংশয় হলাম। মোরখামের পাহাড়ী কন্যার দেশের পাহাড়গুলো ছিল স্নিগ্ধ সবুজ ও মায়াময়। অনেকটা পাহাড়ী কন্যার প্রিয় সখিদের মতো। কিন্তু এখানের গিরিরাজের পাহাড়গুলো কাটখোট্টা রসকসহীন দারোয়ানের মত, মাথা উঁচু করে

ইস্ত্রী করা পোষাক পড়ে পাহাড়া দিচ্ছে। দেখলে ভয় লাগে, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগে না।

আল মাগারেবী থেকে আমাদের এবারের গন্তব্য মসজিদে গারেজ। এটা আরো উচু এবং তাই এলাকার মারকাজ মসজিদ আল কালা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ছোট ছেলের মত চুপটি করে বসে আছে। মসজিদের সঙ্গেই লাগানো খাড়া গিরিখাদ সরাসরি নেমে গেছে গভীর অতলে। পা পিছলে গেলে নিচে মাটিতে পড়ার আগেই দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে হবে। একটু দূরে এলাকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কামর ওসমান। এর মাথায় সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে টেলিফোন ষ্টেশনের টাওয়ার, একাকী ও নিঃসঙ্গ, অনেকটা সেনাবাহিনীর 'সেন্ট্রি অন ডিউটি' এর মতো। এখানেই এক ধরনের ফনি মনসার ঝোপ দেখলাম যার পাতা প্রায় এক ইঞ্চির মতো পুরু, অনেক চওড়া, বড় এবং পাতার গায়ে কোন কাঁটা নাই। গাছের মতো কান্ড। এছাড়া এখানে আমাদের দেশের মতো ফনি মনসার জঙ্গল প্রায় সব জায়গায়ই প্রচুর। হলুদ ফুল ফুটে আছে অজস্র। তার সঙ্গে হালকা লাল ফল। ফলের ভেতরে লালচে বিচি ছোট ছোট ছেলেদের অনেক সময় সে সব ফল খেতেও দেখেছি। একটু টক ও হালকা মিষ্টি। ফনি মনসাকে এখানে বলে 'বারাম'। আমাদের দেশের প্রায় সব ধরনের গাছই এখানে দেখা যায়। আব্দুল্লাহ আলী ভাই বললেন আগামীকাল জুমার নামায আল কালা পাহাড়ের মাথার উপরের এক মসজিদে পড়তে হবে। কারণ ঐ এলাকার এক সাথীভাই সওগী এর বিয়ে উপলক্ষ্যে তিনি আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি চিল্লার সাথী। এক স্ত্রী নিয়ে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর সংসার করেছেন। কোন সন্তান নাই। তাই এতদিন পরে নিঃসন্তান স্ত্রী ও বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়দের ইচ্ছায় তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হচ্ছে। ইয়েমেনে একাধিক বিয়ে করা পুরুষ এবং মহিলা সকলের কাছেই 'ঘর কা মুরগী ডাল বরাবর' এর মতো। ভাই সওগী যে নিঃসন্তান এক স্ত্রী নিয়ে পঁয়ত্রিশ বৎসর সংসার করেছেন শুনে খুব ভাল লাগল। এদেশে এমন নজীর খুব কম।

কিছু কিছু মানুষের জীবনের এমন কিছু অদ্ভুৎ ঘটনার কথা শোনা যায় যা সহজ বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বোঝা ও মানা কঠিন। আব্দুল্লাহ আলী ভাই এর এমন কিছু ঘটনা কথা প্রসঙ্গে জানলাম যা ধারণার বাইরে। মূলত প্রথমে ছিলেন রাজ মিস্ত্রী, পাথরের ঘর বানাতেন। পরে তবলীগের মেহনতে আল্লাহ পাক তাকে জুরে দেন। দিল্লী সফর এর কিছু দিন পর পাকিস্তানও সফর করেন। ২০০০/২০০১ সালের দিকে কুয়েতে চিল্লার ফয়সালা হয়। ইজিপ্ট থেকে তিনশত জনের এক বিরাট জামাত জলপথে কুয়েত যাত্রা করে। সাধারণতঃ এই সফরে আট দিন সময় লাগে। সব সাথী পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে জাহাজে উঠেছিল। সবার শেষে তিনি ঘাটে আসেন অথচ ভিসা হয়নি তখনও। এদিকে জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে

গেছে। শেষে যে মহিলা অফিসার জাহাজ ছাড়ার অনুমতি দেবেন তিনি নিজেই ভিসায় সিল মেরে তাকেসহ জাহাজ রওয়ানা করিয়ে দেন। তিন/চার দিন জাহাজ চলার পর হঠাৎ করে তারা সামুদ্রিক ঝড়ে পড়েন এবং হাল, কম্পাস এবং বেশ কিছু যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায়। সমুদ্রে পথ হারিয়ে তারা দিশাহীনভাবে ভাসতে থাকেন। কোথায়ও যোগাযোগ করা অথবা অন্য কোন জাহাজের দেখাও তারা পেলেন না। কয়েকদিন ঝড় চলল। তাদের কয়েক জনের দায়িত্ব ছিল প্রতি দিন তিন বেলা তিনশত জনের জন্য রুটি বানানো। ঝড়ে এমন অবস্থা হল যে, রুটি তন্দুরে দিতে গেলে ঝড়ের ঝাপটায় রুটি যেয়ে সাগরে পড়ে। নামায পড়তে গেলে ঝড়ের ধাক্কায় কেবিনের এক দেওয়াল থেকে অপর দিকের দেওয়ালে যেয়ে আছাড় খেয়ে পড়তে হয়। তারা মাশোয়ারা করে শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন। অবশেষে একদিন ঝড় থেমে গেল। জাহাজ সমুদ্রের বুকে অনির্দ্ধারিত ও লক্ষহীন ভাবে বাতাসে দুলতে ও চলতে থাকল। এভাবে এক মাস কাটল। পরে একদিন ভোরে দেখেন, উনারা করাচী বন্দরে পৌঁছে গেছেন। অবশ্য তারা অনেকে এর আগেই জাহাজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এই বিপদ কেটে গেলে তারা চার মাস এর বদলে এক বৎসর সময় লাগাবেন। ফলে কুয়েতে সময় লাগানো হয়ে গেলে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, মক্কা মদীনায় সময় লাগাবেন। কিন্তু কোন ভাবেই মক্কার ভিসা পাওয়া যাচ্ছিল না। সবাই যখন প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন, তখন আলী ভাই সেই রাত্রেই স্বপ্নে হুজুর (স.) এর দিদার লাভ করেন এবং তাদের মদীনা জিয়ারত হবে এই সুসংবাদ পান। পরের দিন তারা সত্যই মদীনা যাওয়ার ভিসা পেয়ে যান এবং অবশিষ্ট সময় আরবে দাওয়াতের মেহনত করেন। জিয়ারতে বাইতুল্লাহ ও মসজিদে নববীও তাঁদের নসীব হয়। আমাদের সবার মনের গোপনে লালিত ওমরা করার খায়েসের কথাও এ সুযোগে তাকে আমরা জানালাম। আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি নিজেও আমাদের জন্য চেষ্টা করবেন বলে কথা দিলেন।

হঠাৎ করে দুপুরেই কানাবেজ থেকে ভাই আলী হাসান নাজ্জারীসহ চার জন সাথী এসে হাজির। তারা শবগুজারী করবেন এবং শুক্রবারও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আব্দুল্লাহ আলী ভাইয়ের এক বন্ধু ভাই জাহিদ এই এলাকার পুলিশ। তিনিও আমাদের সঙ্গে সময় লাগাচ্ছেন। ইউনিফরম ছাড়া জোব্বা গায়ে আমাদের সঙ্গে দাওয়াতের কাজ করতে দেখে এলাকার লোকজন অবাক হয়। মাঝে মাঝে প্রশ্নও করে। কিন্তু পুলিশ ভাই এর কোন তোয়াক্কা নাই সে সবে। নিজেই খেদমতে, জাওলায় এবং গাস্তে অংশ নিচ্ছেন। বেশ ভাল লাগে। ইতোমধ্যে হুদাইদা থেকে নাজ্জারী ভাই আমাদের সবার পাসপোর্টও নিয়ে এসেছেন। সময় দিয়েছে ১৪/০৫/০৯ পর্যন্ত। শুক্রবার সকালের মাশোয়ারায় সুন্দর কিছু কথা শুনলাম। আল্লাহপাক তার কুদরাতী হাতে মানুষ সৃষ্টির আগে নিজ হুকুমে অসংখ্য

মখলুক সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রয়োজনের জন্য এবং কারো পরামর্শ ছাড়াই। অথচ মানুষ সৃষ্টির সময় তিনি ফেরেস্তাদের নিয়ে মাশোয়ারা করেছেন। কারণ তিনি মানুষকে তার খেলাফত দিয়ে অর্থাৎ তার দ্বীনের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন। এজন্য দ্বীনের মেহনতে পরিশ্রম জরুরী। দ্বীনের জন্য সব নবীকেই কষ্ট মোজাহাদা করতে হয়েছে। হুজুর পাক (স.) এর ক্ষেত্রে এটা ছিল সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলেই তাঁর জন্য এটা সহজ করে দিতে পারতেন, ইচ্ছা করলেই মদিনাতে হিজরত করার সময় হুজুর (স.) এর জন্য বোরাক পাঠিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। অথচ তোহফা হিসাবে যখন নামায দিতে চাইলেন তখন বোরাক পাঠিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছেন আরশে মোয়াল্লায়। আল কোরআনসহ দ্বীনের সব হুকুম জিব্রাইল (আ.) স্বয়ং নিয়ে এসেছেন। কিন্তু নামায এর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক নিজে তার প্রিয় হাবিব কে কাছে ডেকে নিয়ে তোহফা দেন। সুতরাং এত বড় নেয়ামতের জন্য আমাদের কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিৎ তা সহজেই অনুমেয়। অথচ এ বিষয়ে আমরা কত বেখেয়াল ও উদাসীন।

আল কালা পাহাড় প্রায় তিন হাজার মিটার উঁচু। আমাদের বর্তমান মসজিদ থেকেও প্রায় চারশত/পাঁচশত মিটার উপরে। একদম সোজা, খাড়া পাহাড়। ফলে এটুকু যেতে পঁচিশ/ছাব্বিশটা দুর্গম বাঁক পার হতে হল। অনেক জায়গায় একশত/একশত পঞ্চাশ মিটার নিচে থেকে পাথর গেঁথে দেওয়াল তুলে তবে রাস্তা করা হয়েছে। প্রায় জায়গায়ই পাড় একদম খাড়া ভাবে নিচে নেমে গেছে। ল্যান্ড রোভারকে অনেক কষ্ট দিয়ে তবে আমরা উপরে উঠলাম। পুরাতন ছোট মসজিদের পাশেই বড় করে নূতন মসজিদটা নির্মিত হয়েছে। দুই ধারে খাড়া দেওয়াল। নিচের দিকে বাড়ী ঘর ম্যাচ বক্সের সমান দেখাচ্ছিল। মসজিদটা ম্যাচের ডজন এর প্যাকেট এর সমান এবং মানুষ জনকে ছোট পুতুলের সমান মনে হচ্ছিল।

ইয়েমেন এসে এত উঁচু পাহাড়ে এর আগে আর উঠিনি। চারদিকে অসংখ্য বড় বড় বোল্ডার পড়ে আছে। একদিকে পাহাড়ের একটা মাথা প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ ফুট শুন্যে বেড়িয়ে আছে। এর আগে মুরখাম ইত্যাদি যেসব পাহাড়ে গেছি এখান থেকে সেগুলিকে ছোট্ট টিলার মতো মনে হল। এখানে মসজিদের কেবলা প্রায় পূর্ব উত্তর মুখী অর্থাৎ কাবা শরীফ এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। নিচের উত্তর পশ্চিমে পুরা মুয়াররাস এবং একটু উত্তর পূর্বে পুরা দাহারে মদীনা। দৃষ্টি সীমা বহুদূরে চলে গেল। কিন্তু অপরিচিত জায়গা জন্য তেমন কোন আগ্রহ জাগল না। পূব দিকেই আরো একটা পাথরের খাড়া মাথা শুন্যে বেড়িয়ে আছে। স্থানীয় সাথীরা জানালেন যে, কিছুদিন আগে এক পাগল ওখান থেকে লাফ দিয়েছিল। তার শরীরের অসংখ্য খন্ডের মধ্য থেকে মাত্র কিছু খন্ড পাওয়া গেছে। মনে হয়

বেচারা মৃত্যু কি তা বোঝার আগেই দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। পরে পাথরে বাড়ী খেয়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। নিচে তাকিয়ে দেখলাম, হালকা হালকা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় সাথীরা বললেন, এখানে উপরের এই এলাকায় সাধারণতঃ বৃষ্টি বেশি হয় না। তবে মস্ত বড় একটা কুয়া মসজিদের সঙ্গেই পাকা সিমেন্ট ও পাথরে তৈরি করা আছে যার তলায় এখনও কিছুটা পানি জমা আছে। অনেকটা প্রায় ছোট পুকুরের মতো। পাথর দিয়েই নিচে নামার সিঁড়ি করা আছে ঘাটে যেয়ে অজু করার জন্য। সামনে মুখ বের করে দিগন্তের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা পাহাড়ের ঐ বেড়িয়ে থাকা অংশে যেতে মন টানছিল। এক সাথী এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতেই উনারা আমাদের ঐ পাহাড়ের মাথায় নিয়ে গেলেন। আসলে শুন্যে বেড়িয়ে থাকা ঐ মাথাটা ষাট/সত্তর মিটার হবে। পাথরের উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। মনে হল বিশাল সমুদ্রের উপর মহাশুন্যে দাঁড়িয়ে আছি, পায়ের নিচের অনন্ত বিস্তৃত সবুজ এর আলপনা। দুই এর মাঝে সাদা মসলিনের হালকা আভরণ। মেঘকে পেজা তুলার মতো দেখবো– তা দেখলাম না বরং মাথার অনেক উপরের ভেসে বেড়ানো মেঘমালাকে আগের মতোই ঐ রকম উঁচুতেই দেখলাম। আগের মতোই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে আমাদের অবাক ও স্থির দৃষ্টিকে অবলোকন করছে। দুই মেঘের মাঝে আমরা প্রকৃতির বিচিত্র রং রূপ রহস্য ঘেরা মোহনীয় কুহুকে আবৃত হতে থাকলাম। সুবহানাল্লাহ। তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর, কত বিচিত্র, কত অপরূপ। না জানি তুমি কত সুন্দর! কত অপরূপ, কত মহিমাময়।

এবার প্রসঙ্গান্তর বলি, ছোট্ট একটা ধাঁধাঁ, এক দেশে এক পাহাড়ের তলদেশে এমন একটা আঙ্গুর গাছ ছিল যেটা বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের উপরের সবগুলো বাড়ীর ঘরের জানালা এবং দরজা দিয়ে ভেতরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে ফেলেছে। থোকা থোকা আঙ্গুরও সেই ভেতরের ডালগুলোতে ধরেছে। তবে গাছের এই বৈশিষ্ট্য শর্ত সাপেক্ষ। প্রত্যেক বাড়ীর লোকদেরই পাহাড়ের নিচে ঐ গাছের গোড়ায় নিয়মিত নির্দ্ধারিত নিয়মে পানি দিতে হয়। প্রথম প্রথম সবাই এ কাজ করল। গাছে আঙ্গুর ধরল। সেগুলো বড় হল। এর পর তারা সবাই পাহাড়ের গোড়ায় পানি দেওয়ার পরিবর্তে ঘরে আঙ্গুরের থোকায় পানি দিতে লাগল, যেন তার ঘরের আঙ্গুর আগে পাকে। প্রশ্ন হল, কার ঘরের আঙ্গুর আগে পাকবে? উত্তরটা খুবই সোজা। কারো ঘরেই আঙ্গুর পাকবে না। গোড়ায় পানি না দেওয়ার কারণে গাছই মরে যাবে। আঙ্গুরও শুকিয়ে যাবে। আসলে দ্বীন নামক আঙ্গুর গাছের গোড়ায়ও তেমনি নিয়মিত দাওয়াতের মেহনতের পানির সেচ দিতে হবে। তবেই গাছও বাঁচবে এবং ঘরে বসেই আঙ্গুরও খাওয়া যাবে নিয়মিত ভাবে। হুজুর পাক (স.) ও তাঁর সাহাবীরা দ্বীনের যে আঙ্গুর গাছ আমাদের জন্য দিয়ে গেলেন আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তা আজ ঘরে ঘরে পৌছে গেছে।

সবাই ঘরে বসে নামায ও তসবিহ্ তাহলিল নিয়ে ব্যস্ত। সত্যিকার দ্বীন বুঝার ও মানার জন্য যে মেহনত প্রয়োজন তা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। প্রকৃত দ্বীন আজ কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে তার প্রকৃত চেহারা হারিয়ে ফেলছে। এখন আর শুয়ে বসে অলসতা করার মতো সময় ও সুযোগ কোনটাই নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই এটা অনুধাবন করে কাজ শুরু করতে হবে। Think for today, tomorrow is too late. (আজই কাজ শুরু করতে হবে, আগামীকালের জন্য দেরী করলে তা অনেক বেশি দেরী হয়ে যাবে)।

শনিবার সকালে নাস্তা শেষে যাত্রা হবে শুরু। এই দুইদিনে এখানেও ভালই মেহনত হয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষক বেশ কয়েকজন দাওয়াতের মেহনতে উৎসাহ নিয়ে আমাদের সঙ্গে বহু সময় দিলেন এবং বিভিন্নভাবে অংশ নিলেন। স্থানীয় ভাবেও জনগণের বেশ সাড়া পাওয়া গেল। আমাদের দলে এখন নয় জন সাথী। ভাই আব্দুল্লাহ আলী, জাহিদ ভাই ও ভাই মোহাম্মদ আমাদের সঙ্গে থাকবেন। জামাত বড় হওয়ায় আমরা এখন আলি ভাইদের বুঝিয়ে রাজী করাতে পেরেছি নিজেরা রান্না করে খাওয়ার বিষয়ে। ঝাল ছাড়া রান্না খাওয়ায় অনভ্যস্ত মুখ ঝাল খেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সব শুনে শেষ পর্যন্ত উনারা সম্মত হলেন। আমরাও খুশি হলাম। এই মারকাজ থেকে এ পর্যন্ত কোন দিন কোন জামাত বের হয়নি। জামাত হিসাবে আমাদের এই জামাত-ই প্রথম যা এই মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে জামাত হিসাবে যাচ্ছে। ফলে বিশেষ একটা আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হল। বিশেষভাবে দোওয়া করা হল যেন, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এখান থেকে নিয়মিত জামাত বের করার মতো অবস্থা তৈরি করে দেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মসজিদ আল হাযান। তারপরেই যাব আর রাহমাহ মসজিদে। আব্দুল্লাহ আলী ভাই এর ল্যান্ড রোভারের ছাদের উপরে মালসামানা তুলে রওয়ানা হলাম। গোটা পাহাড়টাই লোক বসতিতে পূর্ণ, অনেকটা শহরের মতো গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ী ঘর। এই এলাকায় মার্কাজ মসজিদ আল গারেজ সম্পর্কে শুনেছিলাম যে মসজিদটি সাতশত বছরের পুরানো কিন্তু এই মসজিদ তার চেয়েও অনেক সিনিয়র। প্রায় আটশত বছর পার করে দিয়েছে। এই মসজিদের দেওয়াল গুলো পাথরের দেওয়াল। জায়গা হয় না মুসল্লিদের। কিন্তু পাকা করার ক্ষেত্রেও সমস্যা অনেক। মসজিদের দক্ষিণ পূর্বে ও দক্ষিণ পশ্চিমে দুইটা বড় বড় পানি জমা করার গভীর কুয়া। অন্য দুইদিকে গভীর খাদ। এছাড়া আর জায়গা নেই। কুয়া দুইটার একটা তো প্রায় বিশ/পঁচিশ হাত চওড়া। একটার পানি ফুরালে তবে অন্যটা ব্যবহার করা হয়। চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। কিন্তু অনাবাদি নয়। পাথর তুলে তিন/চার হাত পর পর আইল বেঁধে ছোট ছোট ক্ষেত বানানো হয়েছে। এমন কি দুই/তিন হাত জায়গা পেলেও তাকে কৃষির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। তাকালে মনে হয়, চারিদিকে সারি

সারি অসংখ্য গ্যালারী বানিয়ে রাখা হয়েছে। চতুর্দিকের গ্যালারী মধ্যের নিচু কোন এক অজানা মঞ্চের উদ্দেশ্যে থরে থরে সাজানো। ঐ গভীর খাদের মঞ্চে কি নাটক মঞ্চস্থ হবে অথবা হবে না তাও জানিনা। তবে দর্শক ছাড়া গ্যালারী দেখতে বেশ ভালই লাগে। জোরা কাটা হয়ে গেছে কিন্তু জোরার শুকনা গোড়া এখনও জমিতে আছেই। কিছুদিনের মধ্যেই এসব আবর্জনা তুলে ফেলে টমেটু বেগুনসহ বিভিন্ন সব্জির চাষ হবে। ভাল লাগল যে এখানে কাদের চাষ নাই। কিন্তু তবু কাদ খাওয়া লোকেরও অভাব নাই।

রাতের আল হাযান অপূর্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে হাজির হলো। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। চৈত্র মাস শুরু হল। আকাশে অসংখ্য সাদা ও প্রায় সাদা মেঘের ভেলা অনন্তের যাত্রায় মগ্ন। তিন দিকেই অনেক দূরের পাহাড়গুলো আলোক মালায় নয়ন স্নিগ্ধকর ভাবে সুশোভিত। এরমধ্যে উত্তরে শহর আল মরওয়া এবং পূর্বে শহর মাহওয়িদ। দুই পাহাড়কে যে পাকা রাস্তা যুক্ত করেছে সেখানে রাস্তার ধারে মালার মতো প্রচুর লাইট জ্বলছে। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় সর্বত্রই আলো জ্বলছে। শহরের আলো ছাড়াও পাহাড়ের থাকে থাকে অবস্থিত বাড়ীঘরে আলো জ্বলছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যে পুরা এলাকা স্তরে স্তরে আলো দিয়ে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সাজানো হয়েছে। একবার ঢাকায় বিডিআর হলের এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় দূর থেকে বিডিআর হলের যে আলোক সজ্জা দেখেছিলাম এটা অনেকটা সেই রকম বলে মনে হল। মূল গেট ও দরবার হলে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। অন্যত্র লাইন করে এবং উঁচু নিচু লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছিল। নিঃস্তব্ধ নিশুতি রাত। ঝিঁ ঝিঁ তো দূরের কথা, বাতাসেরও শব্দ নাই। জোনাকীর ফুলকি ও এসব এলাকায় দেখা যায় না। এক অটল গম্ভীর স্নিগ্ধ মৌনতা চারদিকে ঘিরে ঘিরে বয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে বারে বারে শুকরিয়া জানালাম। সমভূমির মানুষ আমি। পাকিস্তানের ন্যাড়া পাহাড় দেখেছি। কিন্তু এত সুন্দর ও মোহনীয় যে পাহাড় হতে পারে, আল্লাহর সৃষ্টির এত বৈচিত্র যে আমাদের মতো নগন্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষও দেখার সুযোগ পাবে এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ।

ডুবন্ত মানুষ যেমন খরকুটা ধরে ভাসার চেষ্টা করে এখানে আমার অবস্থা ঐ রকম। কেউ কোন রকম একটু ইংরেজী জানে শুনলেই খুশি হই, তারসঙ্গে আলাপের চেষ্টা করি, নিজের মনের কথা চেষ্টা করি তাকে বোঝাতে। কিন্তু এখানে অভাবিত যে সুযোগ আল্লাহ দিলেন তা আশা করিনি মোটেই। এখানের মাদ্রাসায় উঁচু ক্লাসে আমাদের দেশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়ানো হয়। ঐ মাদ্রাসার ইংরেজীর শিক্ষক আলি ভাই রাতে নিজেই এসে অনেকক্ষণ আলাপ করে পরের দিন মাদ্রাসায় যেতে আমাদের দাওয়াত দিলেন। আরো দুইটা ছেলে তারেক ও আব্দুল মজিদ মোটামুটি ইংরেজী বলতে পারে। এর মধ্যে তারেক

একটা চীনা কোম্পানীতে দোভাষীর কাজ করত। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে পড়ছে দুই বৎসর ধরে। আমি তো অকুলে কুল পেলাম। তারেক বিছানাপত্র নিয়ে রাত্রে আমাদের সঙ্গেই থাকল। পাশের পাহাড়টার মালিক ওদের দুই দাদা যারা ছিলেন সহোদর ভাই। মোট পনর/ষোলটা বাড়ী ওদের দুই পরিবারের। পরের দিন মাদ্রাসায় বেশ ভাল আয়োজন হল। শিক্ষকদের আরবী ও ইংরেজিতে দ্বীন সম্পর্কে কথা বলা হল। ইদানিং ডিস কালচার ইয়েমেনে তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখর এর ভয়াল থাবা বিস্তার করেছে। বিশেষতঃ ভারতীয় নগ্ন কালচারের আগ্রাসী থাবা খুব দ্রুত যুব সমাজকে নৈতিকভাবে ক্ষতবিক্ষত করছে। এ ব্যাপারে আলি ভাই খুব চিন্তিত। তারেকও দেখলাম বিষয়টি নিয়ে ভাবছে। বাড়ীতে কেউ কেউ চুপ করে ভারতীয় ছবি দেখে। ভাই তারেক তো একজন কে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েই দিল, ঐ লোকটা হিন্দি ফিল্ম দেখে, পরিষ্কার অসন্তোষ তার গলার স্বরে। আসলে মূল গাছের চেয়ে আগাছা জমিতে দ্রুত বাড়ে। শেকড়ও বেশি মজবুত হয়ে মাটি আকড়ে ধরে। প্রথম অবস্থায়ই এসব আগাছা উপড়িয়ে না ফেলতে পারলে পরে তা সমস্যা সৃষ্টি করে। শিঁকড় এত গভীরে শক্ত হয়ে বসে যায় যে তাকে পরে সহজে উপড়ানোই যায়না। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখানে কি করার আছে? নিজের দেশেই এ ক্ষেত্রে আমরা একান্ত অসহায় আর এখানে আমরাতো বিদেশী!

রাত্রে হঠাৎ তারেক আমাকে প্রশ্ন করল ঈমানের মেহনতকে আমরা তবলিগ বলি কেন? এবং এ মেহনত করলে কি লাভ হবে? সুন্দর প্রশ্ন, শুনে ভাল লাগল। ওকে বললাম, হযরত মওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলতেন আমি এই মেহনতের যদি কোন নাম রাখতাম তবে এর নাম রাখতাম "তাহরিকে ঈমান" অর্থাৎ ঈমানী আন্দোলন। এ কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মুখে বলা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কে বারবার বলা ও শোনার মাধ্যমে দিলের মধ্যে একিনে পরিণত করা। ঈমানের হাকিকত হল হুজুর পাক (স.) এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর জানানো গায়েবী খবর গুলোকেও পূর্ণ বিশ্বাসে দিলের মধ্যে নিয়ে আসা। আলোচনার মাধ্যমে বিবেচনা আসে। যত বেশি ঈমান সম্পর্কীয় আলোচনা হবে দিলের ভেতরে একিন ততই দৃঢ় ও মজবুত হবে। তাই যা দেখি নাই, জানি নাই হুজুর (স.) এর বলা সেই অদেখা আখেরাতের প্রতিটি বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস পয়দা করার মেহনতের নাম তবলিগ। বিদায় হজ্জে হুজুর পাক (স.) বলেছিলেন "বাল্লেগু আন্নি ওয়ালাও আয়া"। সেই বাল্লেগু থেকেই সম্ভবত: তবলিগ শব্দটি এসে থাকতে পারে বলে কোন কোন মুরব্বীদের ধারণা। তবে এখানে মূল কথাটি নামে নয় বরং কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ জন্যই ভারতের হযরত মওলানা সাদ ২০০৬ এ টঙ্গির তিন চিল্লার সাথীদের জোড়ে বলেছিলেন। মানুষ ধ্যানের সঙ্গে আমলের নিয়েতে যেটা শুনবে সেটাই মনে রাখবে এবং সেটাকেই নিজের আমলে

আনতে হবে এবং অন্যের কাছে পৌঁছাতে হবে। যখন অন্যকে পৌঁছানোর নিয়তে আমরা শুনব তখন দিলের ভেতরে একিন পয়দা হবে যা মানুষকে এতেয়াতের উপরে উঠাবে। এ জন্যই দাওয়াতের মেহনত দ্বারা যেটা আমাদের ভেতরে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করতে হবে তা হল ঈমান। আর এই ঈমান যখন দৃঢ় এবং পরিপূর্ণ হবে তখন তা হবে একিন। এই একিন যত সহি হবে আমলও তত সঠিক হবে এবং আমলের বদলাও তদ্রুপ পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে। ঈমান দুর্বল তো আমল দুর্বল এবং আমল দুর্বল তো আমলের বদলা পাওয়াও ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। নিজের ঈমান ঠিক করার জন্য তাই তবলিগ করার কোন বিকল্প নাই। হযরত মওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, আজ যেটা সবচেয়ে বেশি দুঃখের তা হল, মুসলমান এ কালিমার দাওয়াত অমুসলমানদের জন্য মনে করে। তার নিজের জন্য এটার প্রয়োজন যে সবচেয়ে বেশি সেটা সে ধারণাও করেনা। অথচ আল্লাহপাক কোরআন মাজিদে ঈমানদারদের ঈমান আনার কথা বলেছেন। বলেছেন হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আন। হুজুর পাক (স.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঈমানকে তাজা কর। এই ঈমান আনা ঈমানকে তাজা করার অর্থ এই যে, কলেমার দাওয়াত বেশি বেশি করে দিতে হবে। এর ফলে দিলের মধ্যে ঈমান তাজা হবে, ঈমান শক্তিশালী হবে। সাহাবা আজমাইন একে অপরকে ডেকে বলতেন, এসো আমরা কিছু সময় ঈমানের আলোচনা করি। এটার অর্থ-হল ঈমানের আলোচনা করার দ্বারা দিলের ভেতর ঈমান মজবুত করে একিনে পরিণত করা। যার আমল যত বেশি সহি হয়ে যাবে আল্লাহর ওয়াদা নবী ও সাহাবীদের জন্য যেমন সত্য ছিল, ঈমানওয়ালার জন্যও এখনও সেই রকমই সত্যে পরিণত হবে।

আল হাযান মসজিদে দুই দিনের অবস্থান খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। এবারের গন্তব্য ছোট পাহাড়ী শহর আল মুরওয়াহ। এখানে দুইটা মসজিদ এ সময় লাগানো হবে। পাহাড়ের নিচু অংশের মসজিদের নাম তাহত আল রাহমাহ এবং উপরেরটার নাম মুরওয়াহ ফাউক অর্থাৎ নিচু রহমাহ মসজিদ ও উঁচু মুরওয়াহ মসজিদ। প্রথমে তাহত আল রাহমাহ্তে যাব। গাড়ীতে মাল তোলা হচ্ছে, দেখি ভাই তারেক তার বিছানা গাড়ীতে তুলছে। সে আমাদের সঙ্গে এই মসজিদে সময় লাগাবে। বেশ ভালই লাগল। সারাদিন সময় পেলেই দ্বীনের দায়ীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে। এ বিষয়ে ভাই আব্দুল্লাহ আলী খুব সুন্দর একটা উপমা দিলেন। বাজারে টবে অনেক চারা গাছ বিক্রি হতে আসে। ঐ চারা গাছ যদি টবেই রাখা হয় তবে গাছ তেমন বাড়েনা। কারণ গাছের বৃদ্ধি শেকড়ের চারদিকে ছড়ানোর বা বিস্তারের উপর নির্ভর করে। এসব গাছকে টবের ভেতর থেকে তুলে মাটিতে লাগালে গাছের শেকড় ও ডালপালা উভয়ই দ্রুত বাড়ে। বড় গাছ তখন ফলনও দেয় বেশি এবং লোক জন যেমন দূর

থেকে তাকে দেখতে পায় তেমনি নিচে এসে ছায়া পায় এবং ফল খেয়ে আনন্দ পায়। দ্বীনের দায়ী এবং সাধারণ মানুষ এর তুলনা এ রকম। মানুষ টবে বন্দি অবস্থায় নিজের বৃত্তের মধ্যে আটকে থেকে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেনা এবং তার নিজের যোগ্যতাও অবদমিত হয়ে থাকে। এই মানুষকেই যখন তবলীগের প্রশস্ত জমিনে লাগানো হয় তখন সে হয়ে উঠে পূর্ণ বিকশিত এবং লোকজনও তার নিকট থেকে উপকৃত হতে থাকে অনেক বেশি।

দ্বিতীয় দিন স্থানীয় মাদ্রাসায় গেলাম। মসজিদের ইমাম সাহেব নিজেই এই মাদ্রাসার প্রধান। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হল অনেকক্ষণ। ছাত্ররাও কিছু প্রশ্ন করল। সবচেয়ে মজার প্রশ্ন এল এশার নামাযের অনেক পরে। কেতাবী আমল শেষে অনেকেই বসে কথা বলছেন, হঠাৎ ইমাম সাহেব হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন, কবর কে তোমরা কেমন মনে কর? স্বাভাবিক মানুষ কবরকে যে ভাবে বিচার করে প্রশ্নটা সে রকমের নয়। সন্দেহ হল, জামাতের আমিরকে ডাকলাম। আটি ভাঙ্গতে শাঁস বেড়িয়ে এল। এদেশে একদল বেদাতি লোক আছে, তারা তবলীগ বিরোধী। তারা প্রচার করেছে যে, তবলীগের লোকেরা কবর পূজা করে। এমনকি তারা হযরত ইলিয়াস (রহ.) এর কবর তওয়াফ করে। বাড়ীর কাছে কাবা শরীফের তওয়াফ ছেড়ে এবং হুজুর (স.) এর মদীনা শরীফ জিয়ারত বাদ দিয়ে কেন তারা তবলীগের নামে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে কবর পূজা করতে যাবে? এমন প্রশ্ন যে হতে পারে চিন্তায় আসেনি। কিছুক্ষণ আগে তিনি শুধু জামাতের জন্য নামই লেখাননি, বাংলাদেশেও যাবেন বলে কথা দিয়েছেন, এখন তার মুখে এই প্রশ্ন? পরে জানলাম এমন প্রশ্ন প্রায়ই ভাই আব্দুল্লাহ আলীকেও শুনতে হয়। আমাদের ছোট উত্তর: হযরত ইলিয়াস (রহ.) এর জন্ম হয়েছিল বেদাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় বরং বেদাতকে উৎখাত করতে। সুতরাং এ সম্পর্কে যা প্রচার করা হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং খারাপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বরং আসল কথা হল, তবলীগ সব ধরণের বেদাত বিরোধী এবং সমাজ জীবন থেকে বেদআতকে সমূলে উৎখাত করতে সচেষ্ট। তাছাড়া হযরত ইলিয়াস (রহ.) তো দূরের কথা, তার ছেলে মওলানা ইউসুফ (রহ.) এবং তৃতীয় হযরতজী এনামুল হাসান (রহ.) এর কবর যে কোথায় আছে এটাও কেউ বলতে পারবে না। তাদের কবর এমনভাবে সংগোপনে রাখা আছে যা অতীব গোপনীয় এবং সহজে কেউ সেটা খুঁজেও পাবেনা। হাসতে হাসতে তাকে বলা হল, আপনি নিজেও দুই বছরের মধ্যে ঐ দেশে চিল্লায় যেতে চেয়েছেন। নিজের চোখে দেখে আসবেন যে, আমাদের কথা সত্য না মিথ্যা। আপনি বড় আলেম। সুতরাং আপনার চোখতো মিথ্যা বলবে না!

তবে এ কথাও সত্য যে, সব দেশেই এবং সব ধর্মেই কিছু বাতেল পন্থি লোক থাকে যারা বেদাতের জন্ম দেয় ও লালন করে। শয়তানের সহযোগিতায়

এরা মানুষকে বিপথগামী করে থাকে। এমন কিছু মানুষ আমাদের দেশেও আছে যারা পীরের কবর পুজা করে ঝাড় দেয় এবং নানা রকম বেদাতী কায়কারবার করে টুপাইস রোজগার করার ধান্দায় থাকে। এদের সংখ্যা খুবই কম। তিনি নিজেও স্বীকার করলেন যে এ ধরনের লোক ইয়েমেনেও আছে এবং মূলতঃ তারাই এ ধরনের অপপ্রচারে সক্রিয়।

সূর্য যখন মাথার উপরে উঠে তখন তার তাপ থেকে বাঁচতে হলে কোন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিতে হয়। সূর্য যেমন স্থির থাকেনা তার কারণে গাছের ছায়ারও তেমনি স্থান বদলে যায়। সুতরাং যারা সূর্যের তাপের কারণে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকেও গাছের ছায়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থান বদল করতে হয়। একইভাবে দ্বীনের গাছের ছায়ায় যারা অবস্থান নিয়েছে শয়তানের প্ররোচনার তাপ থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকেও দায়ী সিফাতের সঙ্গে দ্বীনের ছায়ায় অবস্থান করতে হবে। শয়তানের নূতন কৌশলকে দ্বীনের সাহায্যে উপযুক্তভাবে মোকাবেলা করতে হবে। যুগে যুগে এ ভাবেই মিথ্যা অপসারিত হয়েছে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ইলিয়াস (রহ.) আমাদের জন্য যে আন্দোলনের পথ খুলেছেন এটা নূতন কোন আমদানি বা আবিষ্কার নয়। বরং হুজুর পাক (স.) এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীরা সারা জীবন যে দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় এবং অগ্রযাত্রার জন্য নিজেদের জান, মাল ও সময় দিয়েছেন, নিজেদের সব কিছু অবলীলায় ও অবহেলায় ত্যাগ করে দ্বীনকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, উপযুক্ত সাথী ও মেহনতের অভাবে সেই দাওয়াতে তবলীগের কাজ মধ্যে কিছুদিন ছাই চাপা পড়ে ছিল। হযরতজী সেই ছাইচাপা আগুনকে ফু দিয়ে আবার জ্বলিয়ে দিয়েছেন মাত্র। হুজুর (স.)এর এবং সাহাবীদের আমল ও আখলাকওয়ালা এই দাওয়াতের মেহনত যতদিন তাজা থাকবে আল্লাহর দীনও ততদিন তাজা ও জীবন্ত থাকবে। এ বিষয়ে ভুল বুঝার কোন অবকাশ নাই। দীর্ঘ আলোচনা শেষ হলো, উপস্থিত সাথীরা একে একে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। আমরাও মাশোয়ারায় বসলাম। আগামীকাল আমাদের প্লেনের টিকেটের সময় বাড়ানোর জন্য আমীর সাহবেকে হুদাইদা যেতে হবে। আমাদের অনেক অতিরিক্ত সামানা ওখানে রেখে আসা হয়েছে। নূতন করে আর কি কি জিনিষ ওখান থেকে আনতে হবে এসব নিয়ে পরামর্শ হচ্ছে। হঠাৎ ভাই আব্দুল্লাহ আলী এসে খবর দিলেন যে, অন্য এলাকার কয়েকজন নূতন সাথী আমাদের সঙ্গে তিনদিন সময় লাগাতে আগামীকাল আসতে চান। আমীর সাহেব থাকবেন না, তার উপর আরবী ভাষায় কথোপকথনে আমাদের প্রচন্ড দুর্বলতা। নূতন মেহমানদের নিয়ে সমস্যা হতে পারে। তবু মাশোয়ারা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তাদের আসতেই বলা হবে। ফয়সালা আল্লাহর হাতে। ব্যবস্থা হবেই ইনশাআল্লাহ।

সখের নূতন ফুলের বাগানে ফুল গাছ লাগিয়ে মানুষ যেমন প্রত্যেক দিন দেখে, গাছে ফুলের কলি এলো কিনা, কিংবা কলিটা কবে ফুটবে, গাছের কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। প্রথম যেদিন ফুল ফোটে, সেদিন তার আনন্দ দেখে কে! বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে ডেকে ডেকে ফুল দেখায়। এ এক অদ্ভুৎ, অপূর্ব, অনাস্বাদিত পুলক শিহরণ, যা শুধু অনুভবের, প্রকাশ করার মতো নয়। ভাবখানা এমন যেন এই ফুল ফোটানোর পুরা কৃতিত্বের সে একাই দাবীদার। আমাদের অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই। বেলা ১১:০০ টার দিকে নূতন সাথীরা মসজিদে এসে পৌঁছালেন। অবাক বিস্ময়ে দেখি, দায়ারে মদিনার পাহাড়ী কন্যার দেশের মসজিদ আল মাসাব এর যে সব সাথী ফসল কাটা শেষ হলে সময় লাগাতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকে ছয় জন সাথী এসেছেন আমাদের সঙ্গে তিন দিন সময় লাগাতে। একি স্বপ্ন না সত্যি! পুলক শিহরণে হৃদয় নেচে উঠল। তালিম রেখে সবাই সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ওরাও খুব খুশি। এ যেন বিরহের সমুদ্র পার হয়ে মিলনের মোহনায় আনন্দের অবগাহন।

বিকেলের গাস্ত, সন্ধ্যার বয়ান এবং এশা বাদ কেতাব শেষে মোজাকারায় বসলাম সবাই। নূতন সাথীদের এই মেহনতের প্রকৃত শেকেল ও গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করা হল। আল্লাহপাক প্রত্যেক নবীকে দুইটা বিশেষ গুণ দিয়েছিলেন। (১) দাওয়াত এবং (২) দোওয়া। সুতরাং প্রত্যেক দায়ীর নিজের মধ্যে এই দুইটা গুণ তৈরি করে নিতে হবে। হুজুর (স.) মানুষের জমিনে সারাদিন দাওয়াত দিতেন এবং সারারাত দোওয়ায় মশগুল থাকতেন। প্রত্যেক নবীই একইভাবে দাওয়াতের কাজ করেছেন। একশভাগ কাজের মধ্যে দশভাগ দাওয়াত এবং নব্বইভাগ দোওয়ার মাধ্যমেই হাসিল হয়ে থাকে। দোওয়ার মাধ্যমে দায়ী যত বেশি আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করতে পারবেন তিনি ততবেশী দায়ী হিসাবে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

আসলে দ্বীনের কাজের জন্য চারটা জিনিষ খুব জরুরী, (১) নিয়ত করা, (২) নিয়তকে সহি অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, (৩) ফিকির করা অর্থাৎ কিভাবে কাজ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে, কিভাবে দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং (৪) দোওয়া করা অর্থাৎ মাখলুক কিছুই করতে পারেনা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এই বিশ্বাস দিলের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে খালেক আল্লাহর নিকট মাখলুকের হিদায়াতের জন্য প্রার্থনা করা। নতুন সাথীদের এসব কথাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করা হল এবং তারা যেন আমাদের সন্তুষ্টির জন্য মেহনত করে আল্লাহকে রাজী খুশি করার উদ্দেশ্যেই দাওয়াতের মেহনতে নিজেদেরকে সঁপে দেন সে জন্য বলা হল। তাদেরকে বলা হল, প্রথম অবস্থায় হয়ত এ কাজের বুঝ দিলে আসবেনা। কিন্তু লেগে থাকলেই সফলতা আসবে। ঝড়ে যে আম বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে যায় তা পায়ের নিচে পিষ্ট হয়

অথবা অন্য কোন সাধারণ কাজে লাগে। কিন্তু যে আমগুলি বোঁটা আঁকড়ে ধরে থাকে এবং যে কোন ভাবেই হোক গাছের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকে সেগুলিই পাকে এবং খাওয়ার যোগ্য হয়ে প্রকৃত সাফল্য লাভ করে।

রাত্রে সিদ্ধান্ত হল, এই মুরওয়া তাইফ মসজিদে একদিন বেশি থাকা হবে এবং পরবর্তী মসজিদ আল শামসন এ শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারে যাওয়া হবে। প্রথমত এতে যাওয়া আসার সময় সাশ্রয় হবে এবং সাথীদের আমলেরও সুবিধা হবে। দ্বিতীয়তঃ এখানে আশেপাশের সকল মানুষের জন্য শুক্রবারে সাপ্তাহিক বড় বাজার বসে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র অর্থাৎ কাঁচা বাজার এখান থেকে করে নেওয়া হবে। সুতরাং মাশোয়ারা শেষ করে তিনজন বাজারে গেলাম। দুইটা ছোট গরুর বাছুর ও দুইটা দুম্বা জবাই হয়েছে। ছোট ছোট দুম্বা/ছাগলের বাচ্চা এবং গরুর বাছুর বিক্রয়ের জন্য বাজারে উঠেছে। গাড়ীতে করে আনা সব ধরনের সব্জি, রশুন, পিয়াজ ও মুলার পাতা খুব বিক্রী হচ্ছে। এদেশের মানুষ কাজকে কেউ ছোট মনে করে না। হাই মাদ্রাসা পড়া কিছু ছেলেও দেখলাম জুতা সেলাই করছে রাস্তার ধারে বসে, বেশ সহজ ও সাবলীলভাবেই। রাস্তায় উপরের এই অস্থায়ী বাজারের কেনাবেচা শেষ হলেই অবশিষ্ট মালামাল নিয়ে পিকআপ ফিরতি পথ ধরে। পরিবারের সদস্যরাই এই সব পিকআপে দোকানের মাল বেচাকেনা করে।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের একটা ধারণা এ রকম যে, আমরাই বোধ হয় সবচেয়ে খারাপ বা দুর্নীতি পরায়ন। এটা যে কত বড় ভুল এটা বিদেশে না আসলে এবং তুলনা করার সুযোগ না পেলে বোঝা সম্ভব নয়। আমাদের রিটার্ন টিকেট করা ছিল, চার মাসের মেয়াদ চেয়েছিলাম, কিন্তু সরকারের সঙ্গে কোম্পানীর নিজস্ব চুক্তির মেয়াদ ঐ সময় পর্যন্ত না থাকার কারণে তা সম্ভব ছিলনা। তারা পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত টিকেট এর মেয়াদ দিয়েছিল। একগাদা টাকা দিয়ে ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সুতরাং টিকেটের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য যেয়ে জানা গেল যে, অতিরিক্ত পঞ্চাশ ডলার করে দিতে হবে। টিকেট কেনার সময় আমাদেরকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, পরবর্তী সময়ে মেয়াদ বাড়াতে সর্বোচ্চ ৫০/- (পঞ্চাশ) রিয়াল লাগবে তাও যখন টুরিস্টিদের ভির থাকবে। এমন কি অফ সিজনে প্লেনের ভাড়াও কম হবে। এখন টুরিস্ট সিজন শেষ। তাদের কথামতো ভাড়া কম হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে ঘটল সম্পূর্ণ উল্টা। যা হোক অনেক দর দস্তুর করে ৫০/- (পঞ্চাশ) ডলার এর স্থলে ৩০/- (ত্রিশ) ডলারে তারা নেমে এল। তারিখ ঐ চৌদ্দই এপ্রিল। তবে বহিঃগমনের সময় বিমান বন্দরে আবারও ৩,০০০/- (তিন হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল দিতে হবে। আর যদি দুই/চার দিন থাকতে চাই তবে আবারও ৩,০০০/- (তিন হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল দিতে হবে। এ যে দেখি লাভের গুড় পিপড়ে

খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু কি আর করা। বিকল্প তো নেই কিছুই। "হাত পা যার বাঁধা তার পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে গোলাম হোসেন?"

শনিবার বেশ সকালেই নাস্তা শেষ করে সবাই চলে এলাম আল শামসন মসজিদে। একদম পাকা রাস্তার সঙ্গে লাগানো এবং অনেক উঁচু মিনার। পশ্চিম দিকে পাহাড়ের খাড়া ঢাল অতল গহ্বরে নেমে গেছে। মসজিদের মিম্বারের চারদিকে সুন্দর "কলির" কাজ করা। চারদিকের দেওয়ালেই কোরআনের আয়াত সুন্দর করে বিশেষ পদ্ধতিতে কেটে বসানো। মধ্যে দুইটা পিলারের মাথা উল্টা ছাতার মতো করে বানানো। তাতে নক্সা করে আল্লাহর নাম সমূহ লেখা হয়েছে। রুচিশীল কাজ, দেখতে ভাল লাগছে। মসজিদের পশ্চিমের দরজা খুলে মিষ্টি ও ঠান্ডা বাতাস গায়ে মেখে এবং অনন্ত অফুরন্ত মায়াবী পাহাড় এর বিচিত্র রূপ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বিরাট বড় দীঘির পানি ছেঁচে শুকিয়ে ফেললে যেমন চেহারা দেখা যায় এখানের পাহাড়ের নিচের অবস্থা তেমনি। অনেক গভীরে তলা বেশ সমান এবং গাছ পালাগুলো উচ্চতায় তিন/চার ফুট বলে মনে হচ্ছে। দুম্বাগুলোকে এক দেড় ইঞ্চি ও সাদা সাদা উইপোকার মতো দেখা যাচ্ছে। আসলে এ যেন একই জিনিষকে ডাইনে বামে সামনে পেছনে উপরে নিচে বিভিন্ন ভাবে দেখা। পাহাড়ী কন্যাকে ভালবেসে হয়ত সমস্ত পাহাড় রাজ্যই আমার প্রিয় হয়ে গেছে। এটা বোধ হয় তারই জের। বসতি হয়নি বা হওয়া সম্ভব নয় এ রকম পাহাড় এবং জোরা চাষের জন্য থরে থরে সাজানো গ্যালারী বিছানো পাহাড়ের ঢাল ছাড়া কোন পাহাড় চোখে পড়ে না। এখন যদিও রিক্ত ধূসরতা একটা করুন বিষাদ মলিনতার আভরণে পাহাড়মালাকে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু জুনের শেষ থেকেই এই ধূসর বিরহের বসন দূরে ছুড়ে ফেলে সবুজ সতেজ সজিবতার গাঢ় পোষাকে সে হয়ে উঠবে নবীনা কিশোরী, হৃদয় মেলে দেওয়া আমন্ত্রণের সবুজ সংকেত ছড়িয়ে দেবে দিক থেকে দিগন্তে, মেঘ বাতাসের শ্যামল কন্যার হাসি হুল্লোরের সঙ্গে সেও নেচে উঠবে ভালবাসার স্নিগ্ধ শ্যামল রঙে, ভরা বসন্তে মেলে দেবে তার যৌবনের প্রতিটি পাপড়ীর আমন্ত্রণ। কোড়ক ভাঙ্গা দলে ফুটে উঠবে যৌবনের প্রাণমাতানো উচ্ছলতা।

আল গারেজ ও মুরওয়ার মসজিদ পার হয়ে আমরা শামসন মসজিদে এসেছি। এটা হুদাইদা মার্কাজের পরে আমাদের ছাব্বিশতম মসজিদ। কাছেই বড় মাদ্রাসা। দুই জন সাথী গেছেন দাওয়াতের জন্য মাদ্রাসায় আর আমরা কিতাবী তালিম করছি। হঠাৎ একটা পুলিশ ভ্যান মসজিদের কাছে এসে থামল। উর্দ্দি পড়া কলাশোনিকভ অর্থাৎ এ. কে-৪৭ নিয়ে কয়েকজন পুলিশ লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নামল। সামনের সিট থেকে একজন অফিসার নামলেন। হালকা পাতলা গড়ন, আনুমানিক বয়স পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন বৎসর। অফিসারসহ সবাই মসজিদের দিকে হেঁটে এসে সরাসরি পায়ের বুট খুলে মসজিদে ঢুকে জিজ্ঞেস

করলেন, এটা কি বাংলাদেশী জামাত? হ্যাঁ সূচক জবাব শুনে অফিসার ভদ্রলোক হাসি মুখে এসে সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্থানীয় সাথী মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের খোঁজ করলেন। কাঁধের উপরে দুইটা বড় তারা, হলুদ রঙের সুতায় তার উপর মনোগ্রাম খচিত। বেশ বড় কোন অফিসার হবেন মনে হল। তাকে জানালাম যে উনি আমীর সাহেব ও মোহাম্মদ আলী ভাইকে নিয়ে খুশুশি গাস্তে গেছেন, এখনই চলে আসবেন। তিনি জামাতের সঙ্গে বসে পড়লেন। আমাদের কোরআন এর মশ্‌ক শুরু হয়ে গেছে। তিনি একজন আরবী সাথীকে নিয়ে কোরআন এর মশক শুরু করলেন। এর মধ্যেই এলাকার পুরাতন সাথী মোহাম্মদ আলী ভাইরা এসে হাজির। দুজন দুজনকে জড়িয়ে চুমু খেলেন। আমাদের সবার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। আমরা নাস্তার ব্যবস্থা করছি এর মধ্যে গাড়ীর উপর থেকে বড় একটা কার্টুন এসে হাজির। তিনি নিজে উঠে যেয়ে কলা, আম, মালটা এবং জুস ইত্যাদি বের করে দিলেন তার তরফ থেকে উপহার হিসাবে। আসলে আমাদের দেশে পুলিশকে আমরা অন্য রকম দেখি। তারা নিতেই অভ্যস্ত, দিতে নয় এটাই সাধারণ মানুষের ধারণা। এখানে উল্টা ঘটতে দেখে অনেকটা অবাক হয়ে গেলাম। নিজের পরিচয় দিলেন, নাম বললেন জেনারেল ফাদ্দাস হাম্মাদ সালাবানি বলে। পদবী জেনারেল। থাকেন এখান থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে আল মাহউয়িদ জেলা শহরে। আমাদের দেশে সেনাবাহিনীতে জেনারেল থাকেন, পুলিশের পদবী আই জি, ডিআইজি ইত্যাদি ছাড়া জেনারেল র‍্যাঙ্ক এর কথা জানিনা। যাহোক নিজের সম্পর্কে বলতে যেয়ে জানালেন যে, তিনি তবলীগের পুরাতন সাথী। এর আগে পাকিস্তানে এক চিল্লা এবং হিন্দুস্থানে এক চিল্লা দিয়েছেন। এবার বাংলাদেশে চিল্লায় যাওয়ার কথা আছে। সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। প্রসঙ্গক্রমে বললেন যে, তবলীগের মুরুব্বী মওলানা সাদ ইয়েমেন সফরে এলে তিনি তাকে নিয়ে সাবা রাজ্যের রানী বিলকিসের 'আরশে বিলকিস' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পুরাতন শহর এর ভগ্নস্তুপ দেখে মওলানা সাদ অপূর্ব একটা কথা বলেছিলেন যা তার খুব প্রিয়। মওলানা সাদ বলেছিলেন, ছোট্ট হুদহুদ পাখি রানী বিলকিসের সাবায় সূর্য পূজা দেখে ফিকির করেছিল কেমন করে তাদের এক আল্লাহর এবাদতে আনা যায়। তার ফিকির এর কারণে রানী বিলকিস ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়ায় রাজ্যের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় পান। নিজেকে ইতিহাসের গৌরবোজ্জল আসনে অভিষিক্ত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ছোট্ট চিড়িয়া হুদহুদের এই ফিকিরে খুশি হয়ে আল্লাহ পাক তার কথা কোরআন মজিদে উল্লেখ করেছেন। তেমনি এ যুগে হিন্দের একটি ছোট্ট পাখি হযরত ইলিয়াস (রহ.) ফিকির করেছেন যে কেমন করে সারা দুনিয়ার সকল মানুষকে আবার ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়ায় ও ইসলামী জীবন জিন্দেগীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়! হুজুর পাক (স.) ও সাহাবীদের দাওয়াতের মেহনতকে তার হারানো গৌরবে পুনঃ

অধিষ্ঠিত করা যায়। আল্লাহ্ এ ফিকিরও কবুল করেছেন এবং সারা দুনিয়ার পাঁচটি মহাদেশেই আজ তবলীগের মেহনত চলছে। অসংখ্য মানুষ এখন দ্বীনের এই মেহনতের মহাযাত্রায় শরীক হয়েছেন। নিজেদের জীবন ও জিন্দেগীকে আবার প্রকৃত ইসলামী ধাঁচে ঢেলে সাজাচ্ছেন। এই জীবন ও মৃত্যু-পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনকে শান্তি সুখের আশ্রয়স্থল করে তৈরি করে নিচ্ছেন। এরপর জেনারেল সালবানি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললেন। এই পাহাড়ী এলাকায় কোন বিদেশী জামাত এ পর্যন্ত আসেনি। আমাদের এই সফরকে তিনি এভাবে মূল্যায়ন করলেন, "বিদেশী তবলীগ এর সাথীদের মধ্যে আপনারাই এই এলাকায় প্রথম, সুতরাং আমি এটাকে কোন কাজের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে 'ফিতা কাটার' সঙ্গে তুলনা করতে চাই। আপনারাই প্রথম এসে এখানে ফিতা কেটে ভবিষ্যতে বিদেশী জামাত যেন এখানে এসে কাজ করতে পারে তার উদ্বোধন করলেন। দোওয়া করুন যেন এলাকায় এখন থেকে বিদেশী জামাত আসে এবং সকল মানুষকে প্রকৃত দ্বীনের উপর উঠার জন্য প্রয়োজনীয় মেহনত করে। আল্লাহ্ পাক সবার পরিশ্রমকে কবুল করুন।"

ব্যস্ত মানুষ, হাতে সময় কম। তিন দিন আমাদের সঙ্গে সময় লাগাতে চেয়েছিলেন কিন্তু এর মধ্যেই ওয়ারলেস এল, তাঁকে এখনই চলে যেতে হবে। সম্ভব হল না জন্য আফসোস করলেন। এক সময় সবাই চলেও গেলেন, কিন্তু আমরা আমাদের মনের মাঝের ঘোর কাটাতে পারলাম না। সত্যিই তো! আমরা তো ফিতাই কাটলাম। কিন্তু যে ধরনের দিল-মন উজার করে; ভালবেসে ও ফিকিরবান হয়ে মেহনত করা দরকার ছিল, আমরা কি তা করতে পেরেছি? আমাদের কমতি, আমাদের অপূর্ণতা, অথবা আমাদের অক্ষমতা বার বার মনের মাঝে প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিল। কিন্তু উত্তর পাচ্ছিলাম না। শুধু এটুকু বললাম, আল্লাহ! তুমি তো জান যে আমরা দুর্বল, আমরা অক্ষম, আমরা অসহায়। তোমার মেহেরবানী ছাড়া আমাদের আর কোনই ক্ষমতা নেই। হে মেহেরবান! তোমার ক্ষমতা দিয়ে আমাদের অক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করে দাও, তোমার সর্বময় ক্ষমতার এক বিন্দুর পরশে আমাদের কাজ করার যোগ্যতা পয়দা করে দাও। তোমার মেহেরবানী দিয়ে আমাদের অসহায়ত্বকে সবল করে দাও। যে কাজের জন্য দেশ, পরিবার পরিজন, ব্যবসা, ক্ষেত খামার, চাকুরীর মায়াকে পিছে ফেলে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে বিদেশের মাটিতে দ্বীনের রাস্তার উপর এনে দাঁড় করিয়েছ, তোমার নিজ করুণায় তাকে সাফল্য মন্ডিত কর। আমিন।

জিনের রাজ্য

মাসাদ মসজিদের সাথীরা তিনদিন সময় লাগিয়ে চোখের পানিতে আমাদের বুক ভিজিয়ে বিদায় নিয়েছেন। এলাকার সাথীদের ইচ্ছার চাপে আব্দুল্লাহ আলী ভাই মাশোয়ারা করে এ মসজিদেও তিন দিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। মঙ্গলবার ইনশাআল্লাহ সাতাশতম মসজিদ বায়তুল হাকামীতে যেতে হবে। এটার অবস্থান বর্তমান পাহাড়ের চেয়েও আরো উঁচুতে। টেলিফোনের একটা টাওয়ার আছে ওখানে। জনবসতিও বেশি। দেখি, আল্লাহ কি ফয়সালা করেন।

গত দুই দিন এলাকায় গাস্ত হয়েছে। তাই আজ সিদ্ধান্ত হল, অল্প কিছু দূরের পাহাড় আল গাজীতে জাওলায় যাওয়ার জন্য। অনেকটা বাংলা চার এর মতো বাঁকানো রাস্তায় মাইল দেড় দুই দূরত্ব কিন্তু সোজা রাস্তা হলে হয়ত পাঁচশত গজ হত। এখানে দুই জন শিক্ষকের সঙ্গেও আলাপ হল। বিকালের দিকে ঘন কুয়াশার মতো মেঘে পুরা এলাকা অন্ধকারে ঢেকে গেল। গায়ে ঠান্ডার হালকা পরশ। যখন এক পশলা মেঘ কেটে যাচ্ছে তখন কিছু এলাকা দেখা হচ্ছে। বাকি অংশ সাদা ধোয়াটে। বাতাসের সাথে মিশে থাকা হালকা মেঘের উড়ে বেড়ানো দেখতে মজাই লাগল।

এই এলাকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় জাবাল ওগিয়ানের প্রায় মাথার কাছে মসজিদে বায়তুল হাকামী। বেশ বড়ই মসজিদ। সঙ্গেই লাগানো প্রাচীন ছোট মসজিদ। হয়ত দশ/বার জন কোন রকমে নামায পড়তে পারতেন। এখানের প্রায় প্রত্যেক মসজিদের সঙ্গেই আদ্দি কালের ছোট্ট মসজিদ গুলোকে অক্ষতভাবে রাখা আছে। বায়তুল হাকামীতে আমরা মেঘের আস্তরণকে গায়ের চাদর বানালাম। প্রায় সবসময়ই মেঘ গোটা পাহাড় ঢেকে রাখছে। হঠাৎ করে কোন সময় আকাশ দেখা যাচ্ছে। চপলা বালিকার মতো এলোমেলো বাতাস ছুটে বেড়াচ্ছে মেঘের আঁচল উড়িয়ে। মাঝে মধ্যেই হঠাৎ করে আঁচল সরে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার আঁচল গায়ে টেনে নিচ্ছে। এই মেঘের লুকোচুরির মধ্যেই এলাকার মানুষ সংসার করছে, জমিতে এক গরুর সাহায্যে বিশেষ ধরনের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছে, জমির পাথর তুলে আইল বানিয়ে জমিকে চাষ যোগ্য করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মেয়েরা মাথায় করে গ্যালন ভর্তি পানি নিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছে। মোটরে করে দোকানীরা শাকসব্জি ফলমুলসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি শেষ করে আবার অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছে। এমনকি ছেলে-মেয়েদের দুই/তিন মাইল দূরের মাদ্রাসায় যাওয়াও বন্ধ নাই। আমাদের প্রথম দিন এভাবেই কাটল। রাতেও এর ব্যত্যয় ঘটল না।

ফজরে হঠাৎ করে চারিদিক পরিস্কার হয়ে গেল। দূরে ওগিয়ান পাহাড়ের মাথায় আধভাঙ্গা দালান কোঠা ও টাওয়ার দেখা গেল। আলী ভাই খুব তাড়াতাড়ি নাস্তা করে নিতে বললেন। কিন্তু 'কপালে আছে হাড় কি করবে চাচা খজিনদার।' গাড়ীতে উঠছি, যাব পাহাড়ের মাথায় জিনের অত্যাচারের চিহ্নসহ পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী দেখতে, হঠাৎ ঘন ধোয়ার মতো মেঘ এসে আমাদের ঢেকে ফেলল। দেখতে দেখতে আশে পাশের সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল ধোয়ার মধ্যে। প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষা করলাম কিন্তু কোনই লাভ হল না। মেঘ বালিকার অত্যাচারের আজ চতুর্থ দিন। কাল সকালে চলে যেতে হবে অন্য মসজিদে। সুতরাং বিকল্প না থাকায় এর মধ্যেই গাড়ী রওয়ানা হল জাবাল ওগিয়ানের মাথার উদ্দেশ্যে। ক্ষীণ আশা, যদি এর মধ্যে মেঘ পরিস্কার হয়ে আসে।

খাড়া পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পথে প্রচন্ড ঝাঁকুনী সহ্য করে যখন পাহাড়ের মাথায় পরিত্যাক্ত ভাঙ্গা ও অভিশপ্ত বাড়ীতে পৌঁছালাম– তখন হালকা মেঘ আবৃত করে রেখেছে পাহাড়কে। তার মধ্যেই দেখলাম, বিরাট বিদ্ধস্ত এলাকা জুরে বাড়ীকে বাইরে থেকে বেষ্টন করে রাখা পর্যায়ক্রমিক তিনটা প্রাচীর আধা ভাঙ্গা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরটা অনেকটা আগের দিনের দূর্গের মতো। উত্তর দক্ষিণে লম্বা পরিত্যাক্ত পাহাড়ী বড় বড় পাথরের তৈরি বাড়ীটির পূর্ব দিকের প্রাচীর সংলগ্ন পাহাড় একদম খাড়াভাবে নেমে গেছে গভীর অতলে। উত্তর দিকে পাঁচটা ঘর, দেয়াল প্রায় অক্ষত কিন্তু ছাদ নাই। মধ্যে পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। স্থানীয় সাথীরা বলল, এটা খাবার ঘর ছিল। এর দক্ষিণে দুইটা করে চারটা কক্ষ। পাথর চাপা পড়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এর সঙ্গেই বেশ বড় ইন্দারার মতো পাথরের পাকা গর্ত যা প্রায় দশ/বার হাত ব্যাস এবং চৌদ্দ/পনর হাত গভীর। নিচে নামার জন্য পাথরের সিঁড়ি আছে। পাথরের দেওয়াল পাথরকুচির সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে দিয়ে (সম্ভবতঃ চুন-সুরকির মিশেল) পলেস্তরা করা। তাতে অস্পষ্ট আরবীতে কিছু লেখা চোখে পড়ল যার পাঠোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। খাওয়ার ঘরের সংলগ্ন পূর্ব দিকের বড় ঘরটির সঙ্গে আগেরটার মতো দুইটা দশ হাত বাই বার হাত গভীর গর্ত। এটাও সুন্দরভাবে পাথরকুচি দিয়ে পলেস্তরা করা। এতে নিচে নামার কোন সিঁড়ি নাই। এর গায়েও কিছু লেখা আছে সন তারিখসহ। কিন্তু এগুলোরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হল না। স্থানীয় লোকজন বলল, এই দুই গর্তে দূর্গের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী ও ধন দৌলত রাখা থাকত। এর উত্তরে তিন তলা সেন্ট্রিপোষ্ট (পাহারা চৌকি)। নিচের দুই তলা ঠিক থাকলেও উপর তলা ভাঙ্গা। চারদিকের দেওয়ালে চারটা ফোকর আছে এবং কোন জানালা নাই। উঠার সিঁড়ি নষ্ট হয়ে গেছে পাথরের স্তুপের চাপে অথবা মনে হয় প্রচন্ড জিনের অত্যাচারের ফলে। শুনলাম, রাত্রি হলে প্রায়ই বড় বড় আগুনের গোলা এসে বাড়ীর বিভিন্ন স্থানে আঘাত

করত। ঘরের ও দেওয়ালের ক্ষতি হলে দিনে ওগুলো ঠিক করা হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ আর ওখানে থাকতে রাজী না হওয়ায় বাড়িটি থেকে ধন সম্পদ ও লোকজন সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় স্থানটি পরিত্যাক্ত হয়ে আছে। বর্তমানে তার পাশেই তিনটা টেলিফোন টাওয়ারসহ বড় প্রাচীর ঘেড়া স্থানটিতে কাউকেই দেখা গেল না। গেটে তালা ঝুলছে।

আমাদের সবার দাড়িতে পানি জমেছে শিশিরের বিন্দুর মতো। মাঝে মধ্যে দুই/এক ফোটা বৃষ্টিও পড়ছে। তবুও সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি মেঘ সরে যাবার। এখান থেকে সামনের পাহাড় গুলোর মধ্যে আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি রহস্য ও বিভিন্ন ঢং এর গঠন বৈচিত্র দেখা যায়। কিন্তু দুই ঘন্টা অপেক্ষা করেও আমাদের কপালে সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হল না। মেঘের প্রাচীর সামনের কিছু দেখার কোনই সুযোগ দিলনা। মনে প্রচন্ড আফসোস নিয়ে শেষ পর্যন্ত গাড়ীর মুখ নিচের দিকে ফিরাতে হল। উর্দু শেয়ের মনে পড়ল "ওহি হোতা হায় যো মনযূরে খোদা হোতা হায়"। এতদিন মেঘ দেখতে ভাল লাগছিল। কিন্তু আজ সারাদিন মেঘকে অভিশাপ দিলাম। অতৃপ্ত মনে নিচে নেমে এলেও ভাঙ্গা দূর্গের বিষয়টি মন থেকে মুছে গেলনা। কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। ভাগ্যও আল্লাহর মেহেরবানী পেল। মসজিদে বায়তুল হাকামী ছাড়ার মাত্র পাঁচ দিন পরেই ওগিয়ন পাহাড়ের উত্তর দিকে প্রায় পাঁচশত গজ নিচে অবস্থিত মসজিদে সিয়েলা এ আমাদের রোখ পড়ল। একদিনের জন্য যাওয়া হবে তাই খুব বেশি কিছু আশা করিনি। কিন্তু ছাপ্পর ফেঁড়ে পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটল। গাস্তের পরে বিকালে দুই জন শিক্ষক এলেন যারা ঐ পাহাড়ের এ দিকের ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় বাস করেন বংশানুক্রমে। তাদের দাদাদের কাছে তারা ঐ পরিত্যাক্ত দূর্গ-সম্পর্কে যে ঘটনা শুনেছেন সেটা এরকম।

তুর্কীদের আগমনের পূর্বে 'আল গাছিনা' বংশের রাজত্বকালে ইয়েমেনের এক পরাক্রমশালী গোত্রপতি আহমদ ইবনে ওসমান হঠাৎ করে এখানে এসে পাহাড়ের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়ে এই পাহাড়ের মাথায় নিজের দূর্গ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন যোগাযোগের মাধ্যম ছিল তুর্য বাদন। তিনি সৈন্যদের তুর্য বাজাতে আদেশ দেন। ফলে আশে পাশের সকল পাহাড়ের বাসিন্দা এসে হাজির হলে তিনি তাদেরকে ঐ পাহাড়ের মাথায় দূর্গ তৈরি করতে নির্দেশ দেন। রাত্রেই জিনরা তাকে স্বপ্নে জানায় যে, এটা জিনদের পাহাড় এবং তারা এখানে তাকে দূর্গ তৈরি করতে নিষেধ করেন। প্রচন্ড ক্ষমতাধর ও একগুয়ে আহমদ এটা বরদাস্ত করতে পারেননি। তিনি একটার বদলে ৩টা বহিঃ প্রাচীর নির্মাণের আদেশ দেন। জিনেরা অনেকভাবে বাধা দিলেও তিনি তা আমলে না এনে সুদান থেকে জিনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে জিনের কিছু মুসলমান ওঝা ও পীর দরবেশ নিয়ে আসেন। দীর্ঘদিন উভয় পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা

চলে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা। আহমদ ব্যক্তিগতভাবে খুব অত্যাচারী ছিলেন এবং প্রজা উৎপীড়ন করতে ভালবাসতেন। ফলে একদিন পেছন দিকে মাথার নিচে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি নিহত হন। তার ছেলেরা ছিল অলস এবং অপদার্থ। তারা এই এলাকা ছেড়ে ইয়েমেনে চলে যায় এবং পরবর্তী এক পর্যায়ে তাদের বংশধরদের দুর্ভাগের অংশ হিসাবে মানুষের বাড়ীতে পানি দেওয়ার কাজ পর্যন্ত করতে হয়েছে। যাহোক এত অত্যাচারের পরেও কিন্তু বেগম সাহেবা কোনভাবেই দূর্গ ছেড়ে যেতে রাজী হননি। একাই তিনি খুবই অনুগত কিছু লোকজনসহ ওখানে থাকতেন। জিনের অত্যাচারও বন্ধ হয়নি, বরং তাকেও স্বপ্নে অনেকভাবে জিনেরা এখান থেকে চলে যেতে বলেছে। কিন্তু বেগম সাহেবা অটল অনড় হয়ে রইলেন। জিনেরা মাঝে মধ্যেই রাত্রে ঘুমের মধ্যেই তাকে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে অথবা অন্য স্থানে নিয়ে যেত, আবার মাঝে মধ্যেই আগুনের গোলা ছুঁড়ে মারত। কিন্তু বেগম সাহেবা আমৃত্যু ওখানেই থেকেছেন। তার মৃত্যুর পর দূর্গটি পরিত্যাক্ত হয় এবং আড়াইশত বছর ধরে ঐ ভাবেই পড়ে আছে। আহমদ দূর্গ থেকে বের হওয়ার জন্য সাধারণ রাস্তা ব্যবহার করতেন না। দুই/তিনটা গোপন সুরঙ্গ পথ ছিল। তিনি সেগুলি ব্যবহার করতেন। বেগম সাহেবার দূর্গ ত্যাগ না করার পেছনে কেউ কেউ মনে করেন যে, হয়ত স্বামীর স্মৃতি ছাড়াও কোন সুরঙ্গে অথবা অন্য কোন স্থানে গোপন সম্পদ ও ধনরত্ন লুকানো ছিল যার মায়া তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি এবং সন্তানেরা অপদার্থ বিধায় তাদেরকেও সম্পদের খোঁজ জানতে দেননি। বছর ত্রিশ আগেও সুরঙ্গগুলো কিছুটা ব্যবহার যোগ্য ছিল কিন্তু এখন অসংখ্য পাথরের ভগ্নস্তুপের আড়ালে সবগুলো সুরঙ্গ হারিয়ে গেছে।

আল গাছিনা বংশটি মনে হয় গাসসান গোত্রেরই রূপান্তরিত রূপ। হুজুর (স.) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে বিভিন্ন সম্রাট ও রাজা বাদশার কাছে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পত্র প্রেরণ করেন। দমেস্কে হারেস গাসসানীর কাছে শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদী (রা.) পত্রসহ প্রেরিত হন। বাদশাহ হারেসের দেহরক্ষী হুজুর (স.) এর বর্ণনা শুনে ঈমান আনলেও হারেস পত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলে। তারপর সে রোম সম্রাটকে তার মনবাসনা জানায়। কিন্তু রোম সম্রাট তাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করে। ফলে সে দূত শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদীকে (রা.) কিছু পথ খরচসহ ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। মক্কা বিজয়ের বছর অত্যাচারী ও দাম্ভিক বাদশা হারেস গাসসানী মারা যায়। আল গাছিনা বংশের পরাক্রমশালী দাম্ভিক গোত্রপতি আহম্মদ ইবনে ওসমান হয়তো ঐ বংশেরই পরবর্তী বংশধর।

মসজিদে সিয়েলাতে একদিনের জন্য এলেও শেষ পর্যন্ত স্থানীয় মানুষদের আন্তরিক অনুরোধে আমাদের দ্বিতীয় দিনও ওখানেই থাকতে হল। এদিন দুই মসজিদে বাদ মাগরিব বয়ান হল। স্থানীয় মাদ্রাসা মসজিদে আমাদের দুই সাথীর

গাস্ত ও সন্ধ্যার বয়ানের দায়িত্ব পড়ল। এ মসজিদটি ওগিয়ানের সোজা পশ্চিমে এবং সিয়েলার মত একই রকম উচ্চতায়। বিকালের দিকে মসজিদে যেয়ে দেখি, মসজিদে সংস্কার কাজ চলছে। নূতন একটি পানির রিজার্ভার তৈরি হচ্ছে কিন্তু কেমন যেন বাঁকা চোরা সাইজ। এরকম অদ্ভুৎ আকৃতি করে তৈরির কারণ জানতে চাইলাম। স্থানীয়রা বললেন, এখানে যে কোন কালে কবর ছিল তারা তা জানতেন না। মাটি কিছুটা খোঁড়ার পর মানুষের বেশ কিছু হাড় বেড়িয়ে পড়ে। সতর্কতার জন্য কিছুটা পাশে সরে যেয়েও আরো কবরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ফলে আর জায়গা না থাকায় গর্তটাকে সুডোল করা সম্ভব হয়নি। মুরুব্বীদের ধারণা যে, ওগিয়ানে যে সকল মানুষ বসবাস করত তারাই তাদের মৃতদেহ এখানে সমাহিত করত এবং এই পুরাতন মসজিদও তাদেরই তৈরি। ঘটনাটা এ কারণে বিশ্বাসযোগ্য মনে হল যে, এ দিকের পাহাড়ী এলাকায় সব পাহাড়েই মসজিদ আছে। কিন্তু ওগিয়ানে নাই। তাছাড়া এত পুরাতন মসজিদ অথচ কেউ এর তৈরির বিষয়ে দাবীদার নাই। পাহাড়ে যারা প্রথমে বসতি স্থাপন করে তাদের বংশধরগণই ঐ পাহাড়ে পারিবারিকভাবে বসবাস করে এবং তারাই সব জায়গায় মসজিদ বানিয়েছে, এটাই দেখা যায়। কিন্তু এখানে এই মসজিদ সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারলেন না। এখানে একটা খুব পুরাতন গাছ লাগানো আছে। সবাই তুবা গাছ বলে এবং এ রকম গাছ আর আশে পাশে কোথায়ও দেখা যায়না। একজন স্থানীয় মুরুব্বী বললেন, তার দাদারাও নাকি ছোট বেলায় গাছটিকে এ রকমই ও এত বড়ই দেখেছেন। গাছটিতে ফুল বা ফল হয়না। অনেকটা নূহ গাছের মতো, তবে চেহারা এক না, আর নূহ গাছগুলো খুব প্রাচীন হলেও তাতে ফুল ও ফল ধরে।

মসজিদে সিয়েলাতে দুইদিন থাকার কারণে পরবর্তী মসজিদ মোখতাহীনে আমাদের দুই দিনের পরিবর্তে এক দিন থাকতে হল। এ দিকের সব পাহাড়ই জাবালে নূয়েরার অংশ। এর প্রধান বৈশিষ্ট পাহাড়ের যে কোন একদিক একদম খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। প্রকান্ড বড় বড় পাথরের টুকরা মাথার উপরের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারপরও মাথার উপরে বেশ কিছুটা অংশ সমতলভাবে ছড়ানো এবং এখানে কোন বসতি নাই ও বাস করার মতো ব্যবস্থাও করা যায় না। একদম রুক্ষ এলাকা অথচ তেল তেলে গোল গোল বোল্ডার বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। বড় কোন গাছপালা নেই অল্প কিছু ক্যাকটাস ও লতাগুল্ম ছাড়া।

মূল জামাত জাওয়ালাতে চলে গেছে, তিনজন স্থানীয় আরবী সাথীসহ আমির সাহেব আমাকে খুশুশি গাস্তে পাঠালেন মসজিদের পশ্চিম দিকের বসতিতে। রাহবার ও মোতারজেম ভাই আইউব এলাকার তবলীগের জিম্মাদার সাথী। দশ/পনরটা বাড়ীর পর আর বসতি নাই। ওখান থেকে পাহাড়ের চূড়ার

দূরত্ব দুইশত গজের মতো। বড় বড় বোল্ডার দিয়ে সাজানো বলে মনে হয়। চূড়ার উপরে আমাকে ওরা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাতে নিয়ে গেলেন। বেশ দূর্গম পথ। বড় কোন গাছ পালা একদমই নেই। পাথরগুলো এত মসৃন যে, পা পিছলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অনেকের ধারণা এখানে জীনেরা বসে বসে এরকম মসৃণ করেছে। পরস্পরের হাত ধরাধরি করে উপরে উঠলাম। উত্তর দিকে একদম সোজা ঢাল অতলে নেমে গেছে। পশ্চিমে যে পাহাড়টা আছে সেখানে নাকি এক কালে প্রচুর বন্য প্রাণী থাকত। এখনও কিছু আছে। তবে দূর্গম এলাকা বলে কেউ ওদিকে মাড়ায় না। নিচে নামছি, হঠাৎ একটা দোতলা বাড়ী নজরে পড়ল। বাড়ীটার নিচের ঘরগুলোতে কোন জানালা নাই। প্রায় চারকোনা ও সমান সাইজের কালো পাথর দিয়ে বাড়ীটা তৈরি। দোতলার ছাদ নাই। ঘরের সামনে নিচু প্রাচীর। গেট ভেতর দিক থেকে বন্ধ এবং পাশাপাশি ঘর দুইটার সামনে মজবুত করে বানানো নক্সাদার দরজা দুইটাও ভেতর থেকে বন্ধ। থমকে দাঁড়ানো দেখে স্থানীয় সাথীরা তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললেন। একজন কানের কাছে ফিস ফিস করে বললেন, জিনের বাড়ী। এখানে দেরী করার দরকার নাই, আশপাশের সবাই এটা জানে। থমকে দাঁড়ালাম। এ কেমন ব্যাপার। ফাঁকার মধ্যে না, সাধারণ লোক বসতির মধ্যে এ রকম একটা বাড়ী যা না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব না। আমরা কিন্তু ঘাবড়ালাম না। বরং গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে জোরে জোরে দাওয়াত দিলাম এবং বাদ আল মাগরীব বয়ানে শরীক হতে বললাম। সাথীরা বলল, আশে পাশের কোন বাড়ীর কোন ব্যাপারেই এরা হস্তক্ষেপ বা ক্ষতি করে না। সবাই সহ অবস্থানে বিশ্বাসী বলে মনে হল। অনেকের ধারণা জিনও মানুষের মতো একই খাবার খায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের খাদ্য হাড্ডি ও গোবর। আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ুতী লিখিত "খাসায়েসুল কুবরা ২য় খন্ডে" আবু নঈম ইবনে ওমর (রা.) এর রেওয়ায়েতে জানা যায়, জিনদের দূত একবার দ্বীপ থেকে এসে হুজুর (স.) এর নিকট কিছুদিন অবস্থান শেষে ফিরে যাওয়ার সময় পাথেয় প্রার্থনা করে। তিনি তার উত্তরে বলেন "আমার কাছে তো এই মূহূর্তে তোমাদেরকে দেবার মতো কিছু নাই। তবে তোমরা যে হাড্ডি পাবে তাতে গোস্ত এসে যাবে এবং যে গোবর পাবে, তা খোরমা হয়ে যাবে।" এ কারণেই হুজুর (স.) হাড্ডি ও গোবর দিয়ে এস্তেনজা করতে নিষেধ করেছেন। হঠাৎ করেই মানুষজনের এলাকায় জিনের বসবাসের বিষয়টি মনে পড়ে গেল। খাসায়েসুল কুবরা ২খন্ডে আবুশ শায়খ ও আবু নঈমের রেওয়ায়েতে বেলাল ইবনে হারেস বলেন, "একবার আমরা নবী করীম (স.) এর সাথে আরাজ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, আমি তাঁর নিকটে পৌছে কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হচ্ছিল যেন অনেক মানুষ ঝগড়া বিবাদ করছে। হুজুর (স.) হেসে হেসে বললেন : "আমার সামনে মুসলমান জিন ও কাফের জিনরা তাদের

বিবাদ পেশ করছে। তারা আমার কাছে থাকার জায়গা চেয়েছে। আমি মুসলমান জিনদের হবসে এবং মুশরিক জিনদেরকে গওরে থাকার জায়গা দিয়েছি, রাবী বর্ণনা করেন গ্রাম ও পাহাড়ের নাম হবস এবং পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় গওর। হবসে বিপদে পড়লে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু গওরে রক্ষা নাই।" সুতরাং বুঝতে পারলাম যে এই এলাকায় যে সব জিন বাস করে তারা সবাই মুসলমান এবং এই এলাকা হবস এর আওতায় পড়ে।

আহম্মদ, বাযযার, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন "একব্যক্তি খয়বর থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হলে দুই ব্যক্তি তার পিছু নিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল: তোমরা উভয়ে ফিরে যাও। অত:পর সে পথিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলল: এরা উভয়েই ছিল শয়তান। আমি ওদেরকে তোমার কাছ থেকে দুর করে দিয়েছি। রাসুলুল্লাহ (স.) কে আমার সালাম বলে দেবে, আর বলবে: আমি আমার কওমের যাকাত আদায় করেছি। জমা দেবার যোগ্য হয়ে গেলেই পাঠিয়ে দেব। লোকটি যখন রাসুলুল্লাহর (স.) কাছে পৌঁছাল এবং ঘটনা বর্ণনা করল তখন তিনি একাকী সফর করতে নিষেধ করে দিলেন"। তবলিগ জামাতে যে প্রথমেই সব সাথীকে জোড়া বেধে দেওয়া হয় এবং কোন অবস্থাতেই একা কোথায়ও বের হতে নিষেধ করা হয় তা সম্ভবত: এই ঘটনা থেকেই নিঃসৃত হয়েছে। ফিরে এসে আমির সাহেবকে সব বললাম। নামায শেষে সব মুসল্লিদের ভালভাবে দেখারও চেষ্টা করলাম। ছোট বেলায় শুনেছি, জিনদের নাকি ছায়া পড়ে না। অবচেতন মনে বিষয়টি বোধ হয় কাজ করছিল। কারণ লোকদের ছায়ার দিকেও আমি তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনই লাভ হল না। আমিও এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে আর আলোচনা করলাম না। ব্যাপারটা এখানেই ইতি পড়ল।

অনভ্যস্থ পাহাড়ী এলাকায় চলাফেরা করা সমতল ভূমির মানুষদের জন্য বেশ কষ্টকর। সবারই পা এর গোড়ালী ফেটে গেছে। কিছু সাথী দুর্বল ও অসুস্থ্য হয়ে পড়েছেন। ফলে মাশোয়ারা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, হাতে সময় থাকলেও আর এখানে সময় না লাগিয়ে আমরা বরং হুদাইদা মার্কাজে ফিরে যাব। মরুভূমিতে বিশ দিন ও পাহাড়ে পঞ্চাশ দিন কাজ করা হয়েছে। সানাতেও কিছু দিন থাকতে হবে। ফলে এখানের পাঠ এখন শেষ করা প্রয়োজন। ফয়সালা শুনে ভাই আব্দুল্লাহ আলীরা আকাশ থেকে পড়লেন। ভাবলেন, তাদের আচরণে অথবা কোন কিছুর কমতি হয়েছে জন্য বোধহয় আমরা চলে যাচ্ছি। সত্যি কথা বলে শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে তাদের রাজী করানো হল। সিদ্ধান্ত হল, পাঁচ তারিখে আমরা এখান থেকে কানাবেজ মার্কাজে যেয়ে দ্বিমাসিক মাশোয়ারায় যোগ দেব এবং ছয় তারিখে হুদাইদা চলে যাব। সদ্য বাংলাদেশে সময় লাগিয়ে ফিরে আসা সাথী ভাই আব্দুল্লাহ সওকী দুপুরে তার বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

সকালে বিদায়ের সময়টা খুব করুণ হয়ে উঠল। তারা একেবারেই ছাড়তে চাচ্ছেন না। ফলে তাদের বুঝালাম দ্বীনের যে কাজ নিয়ে আমরা একত্র হয়েছি, এই মেহনতই আমাদের মধ্যে এই ভালবাসার সৃষ্টি করেছে, আমরা পরস্পর এক হয়ে গেছি। তাই কবির কথায় বলতে হয়–

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি
ছিড়লে নায়ের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।

আসলে আল্লাহর রাজী খুশির আশায় একত্র হয়েছিলাম। আবার তারই রেজামন্দির প্রত্যাশায় আমরা পৃথক হচ্ছি। আর আমৃত্যু এ ভাবেই মিলন বিচ্ছেদের মধ্য দিয়েই দ্বীনের মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। আলমী নবীর আমরাও আলমী উম্মত। সুতরাং চিরস্থায়ী আখেরী মিলনের জন্যই এই স্বল্প বিরহ। ইনশাআল্লাহ, চিরস্থায়ী জান্নাতে আবার দেখা হবে।

ইয়েমেনের হৃদয়

তবলীগ জামাতের সাথীদের কাছে মার্কাজ অনেকটা মেয়ের কাছে মায়ের বাড়ীর মতো। কোন একটা রোখ শেষ করে জামাত মার্কাজে আসে দুই/এক দিন আরাম করে, বিশ্রাম, কাপড় চোপড় কাচা ইত্যাদি কাজ শেষ করে নূতন রোখ নিয়ে রওনা হয় আবার দাওয়াতী মেহনত নূতন এলাকায় নূতনভাবে শুরু করার জন্য। একটানা সত্তর দিন বাইরে থাকার পর আমাদেরও ইচ্ছা ছিল দুই/তিন দিন পরে রোখ নেব। ছয় তারিখ সোমবার বেলা দশটার পরপরই আমরা হুদাইদা মার্কাজে এসে পৌঁছালাম। আজ কোন কাজ নয় শুধু ঘুম আর ঘুম এরকম একটা মনোভাব সবার মধ্যে। মার্কাজ মসজিদের অবকাঠামো উন্নয়ন চলছিল। একটা পাকিস্তানী জামাত কাজ শেষে দেশে ফিরে যাবে আগামীকাল। ওরা সাত জন ও ফরাসী তালেবে ইলেম ইয়াসিন ছাড়া মার্কাজের গেষ্ট হাউজ এক দম ফাঁকা। সুতরাং ভাই লাবীব এলে তাকে বিস্তারিত সব জানিয়ে ও পরামর্শ করে আমির সাহেব আমাদের বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু হা হাতোস্মি! আসরের নামায শেষে আমরা যখন মসজিদ থেকে আমাদের থাকার ঘরের দিকে যাচ্ছি, খবর এল যে, এখন মাশোয়ারা চলছে। আমাদেরও ওখানে যেতে হবে। শুনেই জাগল মনে ভয়, না জানি কি হয়! হলও তাই। মরুভূমি ও পাহাড় যেহেতু পার হয়েছি সুতরাং এবারের রোখ হল শহর এলাকায়। এখান থেকে তিনশত পঞ্চাশ মাইল পূর্ব দক্ষিণের শহর রেদায় আমাদের রোখ নির্দ্ধারণ করে মুরুব্বীরা আমাদের বিদায় দিলেন। ইয়েমেনে যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান আছে সেগুলোর মধ্যে পুরাতন সানা যেখানে রানী বিলকিসের সাবা রাজ্য ও সিংহাসন ছিল, আদন অর্থাৎ এডেন বন্দর শহর, আমরান, সাবোয়া, ইব ও রেদায় অন্যতম। সুতরাং একটা ঐতিহাসিক শহরে রোখ হওয়ার কারণে খারাপ লাগল না। এশার নামায শেষে যখন খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফিরে আসছি তখন মার্কাজের একজন জিম্মাদার জানালেন, আগামীকাল বাদ ফজর আমাদের রেদায় এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। এবার এখান থেকে রোখ শেষে সোজা সানায় চলে যেতে হবে। ফলে সকলেরই নিজের নিজের মাল সামানা গুছিয়ে নিতে হবে। জানতে চাইলাম, এই হঠাৎ সিদ্ধান্তের কারণ কি? উত্তর এল রেদায় মার্কাজের সুরার এক সাথী ভাই আবু রেজাল সুদান থেকে সময় লাগিয়ে দেশে ফিরেছেন। তিনি কাল সকালেই তার নিজের বাড়ী চলে যাবেন। উনার বাড়ী যেহেতু রেদায়, সুতরাং তিনিই রাহবার হবেন এবং আমাদের জামাতের রোখ রেদায় হওয়ার পেছনেও তিনিই মুখ্য কারণ। সাথী ভাই আবু রেজাল রাত্রেই গাড়ী ঠিক করলেন। মাথাপিছু ভাড়া ১,১০০/- (এক হাজার একশত) রিয়েল। বাদ ফজর মাল সামানা গাড়ীতে তুলে আমরা যখন

গাড়ীতে উঠে বসলাম তখনও ঘড়ির কাঁটা দৌঁড়িয়ে ভোর ছয়টার ঘর ছুঁতে পারেনি। মার্কাজের মাদ্রাসার কিছু ছাত্র ও সাথী ভাই এসে আমাদের বিদায় জানাচ্ছিলেন। সূর্যের আলো তখন সবে সোনালী হলুদ রং ধরেছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে ড্রাইভারের পা স্পিডো মিটারের কাঁটাকে চঞ্চল করে তুলল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চমৎকার পিচঢালা রাস্তা ধরে একশত বিশ কি.মি. বেগে আমাদের নিয়ে হাইলাক্স "২৭০০ ই.এফ.আই" একটানা খ্যাপা মোষের মতো দৌড়াতে লাগল। শহর তখনও ঘুমের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রাস্তা বেশ ফাঁকা। আমরা চলেছি যেন "যায় তুফান মেল।"

সকাল আটটায় নাস্তার বিরতি। এদেশের পরোটা গুলো বেশ চমৎকার। মাঝারী সাইজের সসপেনের ঢাকনীর সমান প্রত্যেকটা পরোটার ভেতরে সাত/আট পরদ। এর উপরের ও নিচের পরদ সোনালী ও মচমচে। ভেতরের পরদ গুলো হালকা হলুদ ও নরম। সঙ্গে গুড়া গুড়া ডিম টমেটুর তরকারী (শুকশুকা) ও গোস্তের কিমা। এদেশী সাথীরা সঙ্গে চা নিলেন। আবার গাড়ী ছুটল দূরন্ত বেগে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু একি? আবার যে সব পাহাড় দেখা যাচ্ছে? আমাদেরকে আর পাহাড়ে রোখ দেওয়া হবে না বললেন অথচ আবার সেই পাহাড়ে। বিষয়টি কি? যতই সময় যাচ্ছে পাহাড়ের উচ্চতা ও রুক্ষতা সেই অনুপাতে ততই বাড়ছে। এর মধ্যেই সাত/আটটা ওয়াস পার হয়েছি। গতকাল রাত্রে এদিকে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার আশে পাশের জমিতে বৃষ্টির পানি জমে আছে। রাস্তার দুই ধারেই অসংখ্য আম গাছ ফলভারে অবনত। অধিকাংশই মাটি ছুঁই ছুঁই হয়ে আছে। ওয়াসের উপর দিয়ে বেগে পানি নামছে তবে আধ হাতের বেশি না। ভাবলাম এক রাত্রেই যদি এই পরিমাণ পানি হয় তবে বর্ষাকালে এসব ওয়াসের উপর দিয়ে পানির তীব্র স্রোত উপেক্ষা করে গাড়ী চলে কেমন করে? ড্রাইভার শুনে শুধুই হাসল, কিছু বলল না। এদিকের পাহাড় গুলোর বৈশিষ্ট্য একটু অন্য রকম। আমরা যেমন ভাঙ্গন ঠেকাতে স্তরে স্তরে বাঁশের খুঁটির বেড়া বা প্রাচীর দেই এটা প্রায় সেরকমই মনে হল। উপরের মাটি গুলো যেন নিচে ভেঙ্গে পড়ে না যায় সে জন্য মনে হয় প্রাকৃতিকভাবেই এরকম ব্যবস্থা। ঢাল বেয়ে উপরে উঠছিতো উঠছি। বেলা প্রায় এগারটার দিকে একটা বেশ বড় শহর-এ এসে গাড়ী দাঁড়াল। নাম জেমরা। তাড়াহুড়ার জন্য রাত্রে ডলার ভাঙ্গানো সম্ভব হয়নি। তাই এখান থেকে কিছু ডলার ভাঙ্গানো হল। তারপর আবার চলা। তার আগে মটরশুটির গোছা কেনা হল মুখ নড়ানোর জন্য। হঠাৎ করে ভোজবাজীর মতো পাহাড় হারিয়ে গেল চোখের চার পাশ থেকে। বুঝতে পারলাম যে রেদায় আসলে একটা মালভূমির মতো পাহাড়ের উপরের সমতল ভূমি। এবং এজন্যই পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সাথী বললেন, আমরা আর অল্প সময়ের মধ্যেই রেদায় শহরে পৌঁছে যাব। হঠাৎ করেই যেন প্রকৃতিও তার রূপ পাল্টিয়ে রুক্ষ পাহাড়ী পোষাক

খুলে সবুজ মখমলের পোষাকে নিজেকে আবৃত করে নিল। অদ্ভুদ সুন্দর স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশ। রাস্তার দুই ধারেই আলু, টমেটু ইত্যাদি সবজি এমনকি গমের ক্ষেত চোখে পড়ল। গমের শিষ বেশ বড় ও পুরুষ্ট হয়ে ক্ষেত ভরে আছে। তার পর একটা ছোট বাজার। এরপরে যে দৃশ্য দেখলাম তা আমাদের দেশে দেখা যায় না। যত দূর চোখ যায় সবুজ ক্ষেতের উপর হালকা মতো কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রথমে বীজ তলা বলে ভুল হলেও ভুল ভাঙ্গতে সময় লাগল না বেশি। রাস্তার একদম কাছেই এ রকম কয়েকটি ক্ষেত চোখে পড়তেই অবাক হয়ে দেখলাম, ইয়েমেনের জীবন্ত অভিশাপ, ইয়েমেনের সোনার বিষ বৃক্ষ, গরীবকে আরো গরীব করার ও ধনীকে আরো ধনী বানানোর সোনার জীয়ন কাঠি কাদের ক্ষেত এগুলো। সুন্দর করে সারি বেঁধে লাগানো গাছগুলো আধ হাত থেকে এক হাত করে উঁচু। রাক্ষসের রক্ত চোষা জিহ্বার মতো হালকা খয়েরী কচি ও নরম লক লকে পাতাগুলো বাতাসে দোলা খাচ্ছে। রোদের আঁচ সহনীয় রাখতে মাথার উপরে মশারীর নেটের মতো এক ধরনের জালি পুরা ক্ষেতের উপরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। স্নিগ্ধ মনটা বিষিয়ে গেল। মাঝে মধ্যেই প্রায় ক্ষেত্রের পাশেই অল্প কিছু দূরে দোতলা ওয়াচ টাওয়ার দৈত্যের মতো একাকী দাঁড়িয়ে আছে। অমূল্য সম্পদ কাদ যেন রাত্রে চুরি না হয় তার জন্য রাত্রে এ. কে-৪৭ হাতে পাহাড়াদাররা সারা রাত কাদের ক্ষেত পাহাড়া দেয় আর গাল ফুলিয়ে কাদ খায়।

অবশেষে আমাদের গাড়ীর চাকা শহর স্পর্শ করল। প্রচুর দোকান, হোটেলও প্রচুর। হোটেল গুলোর সামনে বেঁধে রাখা আছে কয়েকটা করে দুম্বা ও গরুর বাছুর। ইয়েমেনের মানুষ বোধ হয় বড় গরু খায় না। এ পর্যন্ত কোন দোকান ও হাটে বড় গরু জবেহ হতে দেখিনি। নধরকান্তি বাছুরগুলো বেশ বড় রাম ছাগলের সাইজের। দুম্বা ও খাসির বাচ্চাও প্রায় তিন/চার মাসের মত বয়েস হবে। এখানে যে হোটেলে আমরা নাস্তা করলাম সেখানে দেখলাম, দুম্বার বাচ্চা জবেহ করে বিভিন্ন সাইজ করে কেটে ছোট ছোট প্লেটে সাজিয়ে রেখেছে। যার যেটা পছন্দ সেটা কিনে দিলেই সেই গোস্ত পছন্দ মতো রান্না হয়ে ক্রেতার টেবিলে চলে আসছে অনেকটা ইউরোপ আমেরিকার ষ্টাইলে। এসব গরুর বাচ্চাদের গোস্ত খেতে একদম খাসীর গোস্তের মতো, নরম ও আঁশ বিহীন।

রেদায়কে বলা হয় ইয়েমেনের হৃদয় বা ক্বলবে ইয়েমেন। জেলা নয় বরং একটা থানার মতো অথচ এখানে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই। বড় বড় কোম্পানীর সব ধরনের মোটর এর শো রুমও এ শহরে আছে। কাদের জন্য এখানের পরিচিতি ব্যাপক। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় শহর হিসাবে এখানে একটি প্রায় দুই হাজার বছরের পুরাতন দূর্গ, সম্রাট আমর আব্দুল ওয়াহাব নির্মিত পুরাতন বাগদাদী মসজিদ, প্রাকৃতিক বিস্ময় দামৃত এর পাথরের কুপ এবং উষ্ণ

প্রস্রবন এবং ইহুদীদের তৈরি প্রচুর পুরাতন বাড়ী। বাড়ীগুলোর চারদিকের দেওয়াল পুরু করে মাটির প্রলেপ বা প্লাষ্টারিং করা। আমাদের ইচ্ছা ছিল, সম্ভব হলে হুজুর (স.) এর প্রিয় সাহাবী, ইয়েমেনের মানুষ, হযরত আলী ও আমির মুয়াবিয়ার (রা.) মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হযরত আবু মুসা আল আশারী (রা.) এবং ইয়েমেনের প্রথম গভর্ণর হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) এর মসজিদ দেখে যাওয়া। কিন্তু রাস্তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং মার্কাজে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে যাবে জন্য সে আশা মনের ভেতরে চেপে রেখেই রেদায় মার্কাজে এসে পৌঁছালাম। এটা রেদায় শহরের পুরাতন অংশের একটা বড় মসজিদ। আগে এখানে ইয়েমেনের এস্তেমা হয়েছে। এমনকি মওলানা সাদ (রহ.)ও বার/চৌদ্দ বৎসর আগে এখানের এস্তেমায় এসেছিলেন ২ বার। সাথীরা সে কথা গর্ব ভরে জানালেন।

প্রশস্ত গেট দিয়ে গাড়ী ঢুকতেই চার/পাঁচ জন সাথী আমাদের দেখে এস্তকবালের জন্য এগিয়ে আসলেন। ভাই আবু রেজাল সম্ভবতঃ আগেই মোবাইলে যোগাযোগ করেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো দশ/বার জন সাথী এসে হাজির। সবাই খুব আন্তরিক। জানলাম, এখানে আগামীকাল এলাকার মাশোয়ারা আছে। সুতরাং আমাদের রোখ মাশোয়ারায় ঠিক করা হবে। আমরা নিজেদের অবশিষ্ট দিনের মাশোয়ারা করে নিলাম। তিনশত/তিনশত পঞ্চাশ গজ দূরে একটা মসজিদ আছে। সিদ্ধান্ত হল, যেহেতু মার্কাজের আশে পাশে বসতি তেমন নাই, সুতরাং ঐ মসজিদে যেয়ে গাস্ত, বাদ মাগরীব বয়ান এবং বাদ এশা কেতাবী তালিম শেষ করে আমরা আবার মার্কাজে ফিরে আসব।

মসজিদে যাওয়ার পথের দু'পাশে প্রচুর কাদ এর ক্ষেত। সবাই ক্ষেতে কাদ এর পরিচর্যায় ব্যস্ত। ফলে আমাদের গাস্তও কাদ ক্ষেত কেন্দ্রিক হল। মাগরিবে বেশ ভাল জমায়েত হল। বয়ান, তাশকীল ও বাদ এশা হায়াতুস সাহাবা পর্যন্ত লোকজন ধৈর্য ধরে মসজিদেই থাকল। জিবুতীর এক সাথী মার্কাজে বেশ নিয়মিত সময় দেন। তিনি গাড়ীতে করে আমাদের মার্কাজে নিয়ে এলেন। মার্কাজের প্রায় সংলগ্ন রেদায় বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় দিন খুশুশি গাস্তে ২ জন করে সাথী বিভিন্ন দিকে গেলেন। আমাদের দায়িত্বে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় সব ছাত্রই একমাত্র আরবী সাহিত্য এবং কোরআন-হাদীস ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না। ভাগ্যক্রমে ইংরেজী বিভাগের কিছু ছাত্র এবং দুই জন শিক্ষকের দেখা পেলাম, কথাও হল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে যা পারলাম, বললাম।

দুপুরের আগেই স্থানীয় সাথীরা মার্কাজে আসছিলেন। আসরের নামাযের পর তিন দলে ভাগ হয়ে সাথীরা মাশোয়ারা শুরু করলেন। রাত্রে আমাদের জানানো হল যে, প্রতি সপ্তাহের বুধবারে এক সপ্তাহের জন্য আমাদের রোখ দেওয়া হবে। এ সপ্তাহে আমাদের জন্য ঐতিহাসিক বাগদাদী মসজিদে দুই দিন,

হযরত আবু বকর মসজিদে তিনদিন ও মসজিদ আল গাজীতে দুই দিনের জন্য রোখ দেওয়া হল। আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া জানালাম যে, না চাইতেই তাঁর রহমতে ঐতিহাসিক মসজিদটিতে রোখ পড়ল। পুরাতন রেদায় এ অবস্থিত মসজিদে বাগদাদীতে আমরা সকালেই পৌঁছে গেলাম এক শুরার সাথীর সৌজন্যে। ফ্যাসিক্স ট্রিটে অবস্থিত প্রাচীন এ মসজিদটির সম্মুখে খুব বড় একটা গম্বুজ এবং প্রায় আট/দশ ফিট উঁচু সিড়ি দুই দিকে বিভক্ত। তুর্কি সুলতান আমর আব্দুল ওয়াহাব কিছু ছোট বড় গম্বুজসহ মসজিদটি তৈরি করেন। কার্নিস গুলো পাথর এর সৌকর্য মন্ডিত এবং বেশ শুশোভিত। ভেতরের পাথরের দেওয়াল প্রায় তিন হাত চওড়া এবং গেটের পাশে আড়াই হাত চওড়া। মসজিদটির মধ্যের ঘরটি বেশ বড় এবং দুই পাশে দুইটা লম্বা ঘর। সম্মুখে বড় বারান্দা। টয়লেটগুলো ও অজুখানা আধুনিক কালে নির্মিত। রেদায় এর এই এলাকা মূলত ইহুদীদের বসতি ছিল। বাড়ীগুলোর বৈশিষ্ট অনন্য। পাথরের তৈরি ঘরগুলোর নিচের দিকের সঙ্গে উপরে অংশের তেমন কোন মিল নাই। অধিকাংশ বিল্ডিং এর বৈশিষ্ট দুই রকমের, কতক গুলোর নিচের দিকে পাথর দিয়ে এবং উপর দিকে মাটির আস্তরণ অথবা উপরে অংশে আধুনিক ষ্টাইলের সিরামিক ইট এর গাথুনী। কতকগুলো বাড়ী নিচের দিকে সম্পূর্ণ মাটির দেওয়াল, ভেতরে মাঝে মধ্যেই কাঠের ডাল ও গাছের ফাঁরাই করা টুকরা দেওয়া। অধিকাংশ বাড়ী তিন/চার তলা। আমাদের দেশের গ্রামের দেওয়াল ঘরে যেমন মাটির ভেতরে কুচি করে কাটা খড় দেওয়া হয় এসব বিল্ডিং এর বাইরের প্লাষ্টারিংও সেই নিয়মেই খড় মাটি দিয়ে তিন/চার ইঞ্চি পুরু করে প্লাষ্টার করা। উপরের দিকে গ্রামের দেওয়াল ঘরের মতোই একটু ভেতরের দিকে ঢুকানো এবং ঐ রকমই ছোট ছোট প্রায় গোল জানালা ও ঘুলঘুলি। গ্রামের মাটির দোতলা দেওয়াল ঘরের উপর আধুনিক তিন/চার তলা বানালে যেমন দেখতে লাগবে অনেকটা সে রকম। আবার পাথরের দ্বিতীয় তলার উপর মাটির তিন/চার তলা বানালে যেমন দেখা যাবে ঐ রকম অদ্ভুৎভাবে বানানো। প্রায় সব বাড়ীই কমপক্ষে তিনশত থেকে ছয়শত বছরের পুরানো। সাথীরা যে কারণ জানালেন তা এই যে, এসব বাড়ী প্রায় সব গুলোতেই ইহুদীদের বসতী ছিল। এই এলাকার মুসলমান বাসিন্দারা বাড়ী বানাতে জানতেন না। মুসলমানরা ইহুদীদের কাছে থেকে বাড়ী কিনে নিতেন অথবা বানিয়ে নিতেন। পরে যখন ইহুদীরা এ দেশ ছেড়ে একে একে ইজরাইল চলে যেতে থাকে তখন পুরা এলাকাই ধীরে ধীরে মুসলমানরা কিনে নিয়েছেন। উপরে যেসব বাড়ী আধুনিক দেখা যাচ্ছে এ গুলো সেই সব পুরাতন বাড়ীকে বর্তমানে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এসব দেওয়ালের উপর লেপাই করা হয়নি। ঝড় বৃষ্টিতে এগুলোর তেমন কোন ক্ষতি হয়না। মাঝে মধ্যে কোন কোন জায়গা নষ্ট হলে আবারও মাটি দিয়ে ঠিক করা হয়। দুই/এক জায়গায় পুরাতন বিল্ডিং

ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। হয়ত ভবিষ্যতে ঐসব জায়গায় নতুন যুগের দালান উঠবে। এই এলাকায় থাকাকালীন সময়ে আমরা দুইটা বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ভেতরে পাথরের সিঁড়ি এবং চারধারের মাটির দেওয়াল গুলো রং করা। শীতে এসব ঘর গরম এবং গরমের দিনে বেশ ঠান্ডা থাকে। এই দুই বাড়ির একটি ছিল চিল্লার সাথী ভাই মোহাম্মদ আলীর । জুমার দিন বিধায় তিনি তার বাড়িতে আমাদের গোসলের ব্যবস্থা করেন। বাগদাদী মসজিদের প্রায় সমসাময়িক এবং ছয়শত বছরের পুরানো এ এলাকার সবচেয়ে বড় মসজিদে জুমার নামায পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন সাথীরা। নাম মাদ্রাসা মসজিদ। বেশ সকাল সকাল আমরা রওয়ানা হলাম মসজিদের উদ্দেশ্যে। কারণ এ দেশে প্রায় সব মসজিদেই জুমার আযান হয় ১১:৩০ মিনিটে এবং বারটার পাঁচ/দশ মিনিট পরেই বেশ লম্বা চওড়া খোতবা শুরু হয়। মসজিদের অবস্থা ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের মতো। এলাকার বিভিন্ন স্থানের মানুষ এখানে জুমার নামায পড়তে আসেন। পরিবেশ বেশ স্নিগ্ধ ও কেমন যেন একটা পবিত্র পবিত্র ভাব। প্রচুর মানুষ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছে। সবকিছু মিলিয়ে বেশ ভাল লাগল। নামায শেষে আবার ভাই মোহাম্মদ আলীর বাসায় ফিরে খেতে বসে জানলাম তিনি শুধু মাত্র মাদ্রাসার শিক্ষকই নন, এই এলাকার একজন উঁচুদরের আলেমও। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছেন তবুও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দাওয়াতের মেহনত নিয়ে বিদেশ সফরে যাবেন। আমার এই পান্ডুলিপি তৈরির সময়ের মধ্যেই তিনি সত্যি ভারত সফর শেষে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে নয় জন সাথীসহ বাংলাদেশে এসেছেন এবং পাবনায় ত্রিশদিন সময় লাগানোকালীন আমাদের সবার সঙ্গে দেখা করেছেন। আল্লাহ তাকে উপযুক্ত যাযা খায়ের দান করুন এবং তার অসুখ থেকে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলুন। আমিন।

মাদ্রাসা মসজিদের অল্প কিছু দক্ষিণেই আল মোহরাবা স্ট্রিটের উপর প্রায় দুই হাজার বছরের পুরাতন ঐতিহাসিক সালমার দূর্গটি মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন প্রাচীন দূর্গের মতো একই ধাঁচে দূর্গটি তৈরি করা। কোনায় কোনায় ওয়াচ টাওয়ার একটু গোল হয়ে প্রাচীরের দেওয়াল থেকে একটু বের হয়ে নিজের স্বকীয়তা প্রকাশ করছে। মূল বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। প্রায় তিন তলা সমান উঁচু একটা বিরাট সমতল পাথরের উপরে পুরা দূর্গটি তৈরি। প্রকান্ড সাইজের গোটা পাথরটি মনে হয় যেন তুলে এনে সমতল ভূমির উপর বসানো এবং কৃত্তিমভাবে তৈরি প্রবেশ পথ ছাড়া কোনদিক দিয়েই দূর্গের উপরে উঠা যায় না। প্রায় একশত চল্লিশ/একশত পঞ্চাশ হাতের মতো চারদিকের প্রাচীর চৌকনা পাথরের টুকরা দিয়ে তৈরি। প্রবেশ পথ বন্ধ এবং সরকারের অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢোকা যায়না। উত্তর পূর্ব কোণে একটু কোনা বেড়িয়ে থাকা পাথরের উপর বেশ বড়

একটা পাথর এমন ভাবে বসানো যে, কয়েকজন মিলে পেছন থেকে ধাক্কা দিলেই সেটা নিচে পড়ে যাবে। সম্ভবতঃ দূর্গের দিকে আসার পথ ঐ দিকে ছিল এবং শত্রু এলে ঐ পাথর ফেলে দিয়ে তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই পাথরটি বসানো হয়েছিল। প্রথমে দূর্গ হিসাবে ব্যবহার করা হলেও পরে এটি রাজদ্রোহী কয়েদীদের জন্য কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করা হত। রাজা সালমারের নামে দূর্গটির নাম। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলনা। তবে দেওয়ালের কিছু অংশ যে আধুনিক কালে মেরামত করা হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। দূর্গটির চারধারেই নিচের বিরাট পাথরটির গায়ে অনেকগুলো মাটির বাড়ী, যেখানে এখনও মানুষ বাস করে। দূর্গটির অযত্ন ও দৈন্যদশা চোখে পড়ার মতো। সবচেয়ে অবাক লাগে এই প্রকান্ড পাথর ছাড়া আশে পাশের পুরা এলাকা একদম সমতল, কোন পাথরও নাই– পাহাড় তো দূরের কথা।

বাগদাদী মসজিদের পর হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে যেয়ে আমরা একদিন বেশি থাকলাম। সাথীরা মার্কাজের মুরুব্বীদের যে ভাবেই হোক রাজী করিয়ে দুই দিনের বদলে তিন দিন ওখানে রাখলেন। আধুনিক মসজিদ। প্রচুর সাথী এবং কাজও ভালই হল। এর পরে আবার পুরাতন শহরের গাজী মসজিদে এলাম। এখানেও আগে ইহুদীদের বসতি ছিল। চার/পাঁচ তলা বাড়ী এখানেও ঐ একই ধাঁচে এখনও তাদের স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। এদিকের সব রাস্তাই চৌকনা পাথরের তৈরি। শহরটি বেশ বড়। শহরের শেষ প্রান্তে উত্তরাংশে কিছু ছোট পাহাড় এবং মরুপ্রায় অঞ্চল আছে যেখানে কাঁটা গাছ ও বাবলা গাছ ছাড়া আর কোন ফসল হয়না। এদিকে নূতন ভাবে বসতি স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেল। বসতির শেষের দিকে বেশ বড় একট মসজিদ আছে। এটাই রদার সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ। এক হাজার বছরের পুরাতন মসজিদের নাম আমেরিয়া মসজিদ। পুরাতন হওয়া ছাড়াও এর অনন্য যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল এই মসজিদে ব্যবহৃত সব খুঁটি খুবই দামী কাঠ 'উদ' এর ছিল। পৃথিবীর অন্যতম দামী আতর উদ এই গাছের কাঠ দিয়েই তৈরি হয়। ফলে যা হবার তাই হল। আধুনিক সভ্য মানুষ যে যখন সুযোগ পেয়েছে সংস্কারের নামে ঐ দামী কাঠ সরিয়ে সাধারণ কাঠের খুঁটি দিয়ে অপসংস্কার করেছে। ফলে মসজিদটি তার বৈশিষ্ট্য এবং স্থায়ীত্ব উভয়ই হারিয়েছে। বর্তমানে মসজিদ ও এর আশেপাশের জায়গায় সংস্কার ও বাগান তৈরি করে পর্যটন স্পট হিসাবে এর ঐতিহাসিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে সরকার। এখানে এখন আপাততঃ নামায পড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে সাথীরা জানালেন।

রেদায় এ নূতন মার্কাজ এর বিশাল এলাকা ঘিরে প্রকান্ড মসজিদ তৈরির কাজ চলছে। প্রতি কাতারে পাঁচ হাজার মুসল্লি হিসাবে ত্রিশ কাতারে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়বে। এই দিকে লোক বসতি প্রায় নাই

বললেই চলে। ভেতরে বড় একটা মাদ্রাসা তৈরি প্রায় শেষের দিকে। ত্রিশ/চল্লিশ জন ছাত্র দেখলাম। সাপ্তাহিক শবগুজারীতে একশত/একশত পঞ্চাশ মানুষ আসবে। ফলে এস্তেমা বা এরকম কোন সমাবেশ ছাড়া মসজিদ খাঁ খাঁ করবে বলে মনে হল। অবশ্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে ভেবে তারা একাধিক তলা করার মতো প্রয়োজনীয় ফাউন্ডেসন এর ব্যবস্থা রেখেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি জংলা খরগোস দেখলাম। আমাদের দেখে দ্রুত লাফ এর পর লাফ দিয়ে চোখের নিমেষে দূরে হারিয়ে গেল।

মার্কাজে যাওয়ার পথে একটা বেশ বড় মসজিদ দেখলাম। এক সাথী জানালেন, মসজিদটিতে নামায পড়া হয়না। কারণ, মিস্ত্রীরা কাজ করার সময় ভুল করে কেবলার রোখ কিছুটা বাঁকা করে গেঁথে তুলেছে। আমার অবশ্য মাথায় এলনা কেমন করে এত বড় একটা মসজিদ এর সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার আগে কেবলার বিষয়টি কেউ খেয়াল করলেন না। আর যদি কেবলা কিছু বাঁকা হয়েই থাকে কেবলার হিসাবে মেঝেতে বাঁকা করে দাগ দিয়ে নিলেই নামায পড়া যেত। জানিনা প্রকৃত বিষয়টি কি! আমাদের গাড়ী একটা রাস্তার বাঁক ঘুরতেই দূর থেকেই আমেরিয়া মসজিদ নজর কেড়ে নিল। বিশাল ও রুচিশীল শিল্প সৈকর্য্যমন্ডিত মসজিদটিতে মিস্ত্রীরা কাজ করছে। উপরে বেশ কয়েকটা ছোট বড় গম্বুজ। চারদিকের কার্নিসের উপরে ডিজাইন করা পাথর এর নক্সাদার অবস্থান। বহিঃপ্রাচীরের উপরও একই নক্সাদার পাথর বসান। নজর কাড়া সবুজ ও সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা মসজিদটিকে গেরুয়া রং করা হচ্ছে। মনে হল পর্যটকদের জন্যই মসজিদটি সাজানো হচ্ছে। একই রকম পাথরের নক্সা বাগদাদী মসজিদেও দেখে এসেছি। তাই মনে হল, এই মসজিদের অনুকরণেই বাগদাদী মসজিদের নক্সা করা হয়েছে। গাড়ী দাঁড়াল না জন্য ভাল ভাবে মসজিদটি দেখা সম্ভব হল না।

'কাদ'-এর রাজধানীতে দুইদিন

আমাদের এ সপ্তাহের জন্য যে তিনটি মসজিদে রোখ স্থির করা হল তা হল, মসজিদ আল নেজ্জারী, মসজিদ আল কোবাইস এবং মসজিদে বীর এ লাহিস। নেজ্জারীর সাথীরা গাড়ী নিয়ে আমাদের এস্তেকবাল করতে এসেছিলেন। মসজিদের পাশে গাড়ী এসে থামতেই নেমে আমরা প্রথমেই দোয়া করলাম। তারপর মাল সামানা নামানো ও মসজিদে যাওয়া। কিন্তু তার আগেই যেটা দৃষ্টি কাড়ল তা হল মসিজদের পাশেই মোটা তারের নেট দিয়ে বড় বড় ঘন সবুজ কাদের ক্ষেতগুলো ঘেরা এবং ক্ষেতের একদিকে চার/পাঁচটা মোটর গাড়ী এবং বেশ কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কাদ সম্পর্কে কিছু লেখা যেতে পারে। কাদ ইয়েমেনের অন্যতম প্রধান অর্থকরি ফসল। শোনা যায় কোন এক আবিসিনীয় তার নিজের নেশার খোরাক জোগাতে দেশ থেকে কাদের চারা নিয়ে এসে এখানে কাদ চাষের গোড়াপত্তন করে। তবে তা কতদিন আগে বা কোন এলাকায় শুরু হয়েছিল তা কেউ বলতে পারলেন না। দেখতে কিছুটা চা গাছের মতো এ গাছগুলো খুব আদর যত্ন পছন্দ করে। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে বেলে-দোআঁশ মাটি এর জন্য উপযুক্ত। প্রচুর পানি দিতে হয় এবং গোড়ার মাটি ঝরঝরে করে বাতাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। গাছ প্রায় এক ফুট উচ্চতা পেলেই কাদ তোলার উপযুক্ত হয়। চা গাছের মতো এর ও ডগার কচি পাতা তুলতে হয়। তবে চা বাগানের বিপরীতে এখানে মেয়ে কর্মির বদলে পুরুষ কর্মি কাজ করে এবং ডগা গুলো পাঁচ/সাত ইঞ্চি করে কাটা হয়। এর জন্য একরকম কাস্তেও আছে। তবে সবাই মূলত হাত দিয়েই দ্রুত কচি ডগা কেটে মুঠো করে। এক মুঠো হলেই তা পলিথিনের ছোট ছোট প্যাকেটে বিশেষ কায়দায় প্যাক করা হয়। প্রতি প্যাকেট একশত ইয়েমেনি রিয়েল থেকে শুরু করে গুন ও মানের ভিত্তিতে প্রায় দুই হাজার রিয়েলে বিক্রী হয়। যে ডগার পাতা যত বেশি নরম এবং পাতার রং যতবেশী হালকা খয়েরী হয় সেই পাতা তত ভাল বলে গণ্য হয়। সবুজ রং এর পাতার দাম কম এবং যেসব ডগার একদম কুশি পাতাগুলো ছাড়া অন্য পাতা খেতে পারা যায় না সে সব প্যাকেট কমদামে বিক্রী হয়।

কাদের ক্ষেতে পানি সেচ অনেকটা ইরি ক্ষেতের মতো। ছোট ছোট ব্লকে পুরা জমিকে ভাগ করে পানি জমা রাখার জন্য ছোট ছোট আইল দিয়ে ব্লক গুলোকে পৃথক করা হয়। যেহেতু বেলে দোআঁশ মাটি, সেজন্য মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুব কম। তাই প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পানি সেচ দিয়ে প্রচুর পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। দুইশত পঞ্চাশ/তিনশত মিটার নিচে থেকে চার ইঞ্চি শ্যালো

বা ঐ রকম মেশিনে পানি তোলা হয়। প্রায় সারাদিনই এই সব মেশিন চালু থাকে এবং জমির ধার দিয়ে কাটা ছোট অগভীর খাল দিয়ে জমি গুলোতে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। কোন জমিতে কবে পানি দেওয়া হয়েছে এবং আবার কবে পানি দিতে হবে তারও হিসাব রাখতে হয়। আমাদের দেশে যেমন পুরা মাঠে একসঙ্গে ধান চাষ করা হয় এখানেও তেমনি অনেক বড় এলাকা জুরে কাদের চাষ করা হয়। প্রায় অধিকাংশ কাদ চাষীরাই ঢনাঢ্য এবং সমাজের উপর তলার মানুষ। কারণ এই চাষে টাকাও যেমন আসে প্রচুর তেমনি খরচও হয় অচিন্তনীয়। প্রত্যেক দিন জমির পরিচর্যার লোককে জমির ফসল দেখাশোনা করতে হয়। নিয়মিত পোকার হাত থেকে রক্ষা করতে বিষ মেশানো পানি স্প্রে করতে হয়। চব্বিশ ঘন্টা পাহাড়া দিতে হয়। বিশেষতঃ রাত্রে তো এ. কে-৪৭ হাতে প্রায় প্রত্যেক জমিতেই পাহাড়াদার থাকে। এছাড়া লোহার খুঁটি দিয়ে এবং তার বা নেট দিয়ে জমির অবৈধ প্রবেশ বন্ধ রাখতে হয়। পাখি যেন জমিতে না বসে সে জন্য জমির উপরে টানা দিয়ে সুতা বা তার টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। পাকা করে পাথরের তৈরি ওয়াচ টাওয়ার ছাড়াও ক্ষেতের বিভিন্ন স্থানে কালো কাপড় দিয়ে অস্থায়ীভাবে পাহাড়াদারদের পাহাড়াপোষ্ট বানানো হয়। মোট কথা খুব বড় লোকের নয়নের পুত্তলী আদরী কন্যার মতো এর অবস্থান। এর পরও আছে গাছ বেশি বড় হয়ে গেলে তিন/চার ইঞ্চি গোড়া রেখে গাছ কেটে ফেলতে হয়। সেখান থেকে নূতন করে কুশি বের হয়। যত বেশি কেটে ঝাড় বানানো হয় ততবেশী কাদের ফলন পাওয়া যায়। বড় গাছের কাদ এর চাহিদা কম এবং দামে সস্তা। যেহেতু খরচ খুব বেশি, তাই উপযুক্ত চাষের জমি গুলো মালিকের কাছে থেকে স্বল্প মেয়াদী লীজ নিয়ে কাদ চাষীরা কাজ করে থাকে। কাদ খাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বিকেল বেলা। প্রায় সব খানেই এবং সব বয়সের ও সামর্থের মানুষ বিকেল হলেই কোন বড় লোকের বৈঠক খানায় অথবা বারান্দায় অথবা দোকানের মেঝেতে কাদের প্যাকেট হাতে বসে যায়, সঙ্গে বোতলে পানি/ড্রিংকস ও বড় লোকের বৈঠক খানায় ফারসী হোঁকায় তামাক চলতে থাকে। কোন কোন বড় কাদের আসরে বিক্রেতাও তার ব্যবসা চালায় এবং নিজেও কাদ খাওয়ায় অংশ নেয়। এ ছাড়া সারা দিনই পথে ঘাটে গালে টেনিস বলের মতো কাদের বল নিয়ে লোকজন চলাফেরা করে। দৃষ্টিকটু হলেও লোকজন "নেসেসারি ইভিল" এর উপদ্রব মেনে নিয়েছে সম্ভবতঃ অনোন্যপায় হয়ে। কাদ রাজধানীতে কাদের প্যাকিংও রাজকীয়। মসজিদের সামনের জমিতে চৌদ্দ জন শ্রমিক কাদ তুলছিল। একটা গাড়ীতে ছাল তুলা চার ইঞ্চির মতো গোল সাইজের এক গাড়ী কলার গাছ। প্রায় আগাগোড়া লম্বা করে কাটা কলাগাছের ভেতরে প্রথমে পুরু করে টিস্যু পেপার বিছানো হয়। তার উপরে খুব যত্নের সঙ্গে ফাঁকা ফাঁকা করে তিন মুঠো কাদ রাখা হয়। তারপর উপরে আবারও পুরু করে টিস্যু পেপার বিছিয়ে

কলাগাছের বাঁকী অর্দ্ধেক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং তিন স্থানে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর এভাবে প্যাকেট করা কলাগাছ গুলো মোটর গাড়ীতে চড়িয়ে পাশের একট দেশে মূলতঃ গোপন ভাবেই বিক্রীর জন্য পাঠানো হয়।

আমরা দুই দিন এখানে ছিলাম এবং দুই দিনই একই দৃশ্য দেখলাম। শুনলাম কোন কোন জায়গায় শাকের মধ্যে একই ভাবে কাদ প্যাক করে শাক হিসাবে বিদেশে চালান দেওয়া হয়। কাদ শুধু ক্ষতিরই কারণ নয়। কাদের প্রসারের ফলে বিদেশী সিগারেট এর অনুপ্রবেশ খুব কমে গেছে। সিগারেট খুব কম চলে। ফলে ঘরের টাকা নেশার কারণে বিদেশে পাচার না হয়ে বরং ঘরেই থাকে। অসংখ্য লোক কাদ লাগনো, পরিচর্যা, কাদ তোলা ও বিক্রিসহ বিভিন্ন কাজ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জীবন যাত্রার দাম যেমন বেড়েছে তেমনি মানও বেড়েছে। যেমন, এদেশে পাথর এর ঘর বানানোর মিস্ত্রীর হাজিরা দৈনিক তিন হাজার ইয়েমেনি রিয়েল। তেমনি আলুর কেজি ২০০/- (দুইশত), টমেটু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ), পেয়াজ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ)। সবচেয়ে কমদামী চাল ২০০/- (দুইশত), গরুর গোস্ত ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) তবে বাছুর ২,০০০/- (দুই হাজার), মুরগী ছোট ১,০০০/ (এক হাজার), দুম্বা ২,০০০/- (দুই হাজার) রিয়েল প্রতি কেজি অথচ সবাই ভাল খাওয়া দাওয়া করেন আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে। একজন সাথী ভাই মেশিন বসানো, পানি সরবরাহ ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাজ করেন। তিনি জানালেন, গরমের সময় তার মাসিক আয় প্রায় এক কোটি রিয়েল এবং শীতের সময়ে ষাট/আশি লক্ষ রিয়েল। এখানে পেট্রোল ষাট রিয়েল লিটার যা আমাদের দেশের ২০/- (বিশ) টাকার মতো এবং কেরোসিন ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ রিয়েল লিটার যা আমাদের দেশের হিসাবে বার টাকা মতো। পাঁচ/দশ মিনিটের জন্য এরা গাড়ীর ষ্টার্ট বন্ধ করে না। প্রচুর টিনজাত সবজী ও মাছের ক্যান বিক্রী হয়। ফলে রান্নার সময় ক্যান কিনে সহজে রান্না করা যায়। প্রচুর গ্যাস আছে জন্য রান্নার ঝামেলাও কম। চায়ের দোকানের মতো যত্রতত্র ছোট ছোট দোকানেই এখানে গ্যাস বিক্রি হয়। ছোট ছোট গ্যাস চুল্লি গুলো এখানে এনে বড় সিলিন্ডার থেকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্যাস ভরে বিক্রি করা হয়। আর দামও খুবই সস্তা। এখানে ছোট গ্যাস সিলিন্ডারের গ্যাসের দাম পড়ে ১০/১২ রিয়েল যা আমাদের টাকায় ৩/৪ টাকা। ইয়েমেনের অর্থনীতি এখন নেশার বাজারের মতো জমজমাট।

ইয়েমেনিদের সততার একটা গল্পও এখন না বললে অন্যায় হবে। আমাদের এ সপ্তাহের রোখ পড়ল শহরের অন্য পাশের তিন মসজিদে। প্রথমে আল নেজ্জারী, তারপর আল দোগাইস ও শেষের তিন দিন বীরে লাইস মসজিদে। আল নেজ্জারীতে অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে যে চমক দেখলাম তা এখনও বিশ্বাস করা কঠিন।

কথাটা বলার আগে কিছুটা পিছনের কথা বলা দরকার। হাজী মিজান ভাই বড় মশারী আনায় সাইফুল ভাই আর নিজের মশারী সঙ্গে নেননি। তিন/চার জন শোয়া যায় এমন বড় মশারীতে উনারা দুইজন এই সাড়ে তিন মাস সহ অবস্থান করেছেন। গত সপ্তাহে মার্কাজে মশারী টাঙ্গানোতে সমস্যা হওয়ায় সাইফুল ভাই মশারী ছাড়াই রাত্রে ঘুমাতে চেষ্টা করেছেন। সেদিন মশারা এমন রাজকীয় ভোজে কেউ বাদ পড়েনি। ফলে সকালে দুই হাত বের করে আমাদের লাল লাল দাগ দেখিয়ে বললেন, আজকেই একটা মশারী কিনব। সঙ্গে সঙ্গেই খোঁজ পাওয়া গেল, মার্কাজের এক সাথী মশারী বিক্রেতা। সুতরাং তার খোঁজ করা হল, পেলামও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তার ব্যাগে তখনও হালকা নেটের একটা মশারী আছে দাম ১,০০০/- (এক হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় ৩৩৫/- (তিনশত পঁয়ত্রিশ) টাকা। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই মশারীটা কিনে নেওয়া হল। তারপর নাস্তা শেষে আমরা আল নাজ্জারী মসজিদে চলে এলাম। সফরে এই প্রথম রাত্রে একা মশারী খাটিয়ে সাইফুল ভাই রাত কাটালেন।

পরের দিন সকাল আটটার দিকে ঐ মশারী বিক্রেতা সাথী উপহার হিসাবে কিছু কলাসহ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অনেক সংকোচের সঙ্গে তিনি যেটা বললেন তা হল, মশারী বিক্রী করতে তার ভুল হয়ে গেছে। আমরা সাইফুল ভাইকে বললাম, জিনিষ যখন কেনা হয়েছে তখন যে টাকা বেশি দিতে হবে তা এখনই দিয়ে দেন। ঝামেলা মিটে যাক। আমির সাহেব তাকে সে কথা বলতেই তিনি জিহ্বায় কামড় খেয়ে যা বললেন তা আর কোনদিন শুনব কিনা সন্দেহ। তিনি বাড়ী যেয়ে তালিকা মিলিয়ে বুঝতে পারেন যে, আসলে ঐ মশারীর বিক্রি দাম ৮০০/- (আটশত) রিয়েল। তাই তিনি গাড়ী ভাড়া করে এবং ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) রিয়েলের কলা উপহার হিসাবে নিয়ে সেই অতিরিক্ত ২০০/- (দুইশত) রিয়েল ফেরৎ দিতে এসেছেন। এই মিথ্যার যুগে একি বিশ্বাস করা সম্ভব? পৃথিবীতে এখনও এমন মানুষ আছে। আসলে সাহাবীদের বংশধরদের আখলাক এখনও যে কত সুন্দর এরকম আরো অনেক নজির দেখে আমাদের বিশ্বাস করতেই হয়েছে।

শহর রেদায় থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'দামত-' এ দুইটা প্রাকৃতিক বিস্ময় আছে যা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি একটা পাথরের কুয়া এবং অপরটি একটি উষ্ণ প্রস্রবন। পাকা রাস্তা ও থানা সংলগ্ন এই প্রাকৃতিক কুয়াটি প্রকান্ড। মাটি থেকে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ ফিট উঁচা এই কুয়াটি সাধারণ কুয়ার মতোই পাথরের দেয়াল ঘেরা এবং এই দুইশত পঞ্চাশ ফিট দেওয়াল নিরেট পাথরের তৈরি। এবড়ো থেবড়ো এই দেয়ালে কোন জোড়া নাই এবং আমাদের দেশের প্রাচীরকে ভাঙ্গনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন ইট গেঁথে দেওয়ালে ঠেক দেই ঠিক এ রকম ভাবেই চার দিকে চারটা ঠেকা দেওয়া এবং

নিচু থেকে উঁচু সম্পূর্ণ সলিড পাথরের যা একদম পুরাটাই প্রাকৃতিক। মাটি থেকে প্রায় একশত পঞ্চাশ ফিট উঁচু এবং কোন রকমে উঠা যায় এরকম এবড়ো থেবড়ো পাহাড় এবং তারপর একদম খাড়া একশত ফিট উঁচুতে উঠতে উপায়ান্তর না পেয়ে বাধ্য হয়ে লোহার সিঁড়ি বানানো হয়েছে। একশত আঠার ধাপ উঠলে একটা ফাটলের ভেতর দিয়ে কুয়ার দেওয়ালের ভেতরে ঢুকতে হয়। সেখানে কুয়ার চারদিকেই পাথরের চওড়া কার্নিস এবং তার পাশেই চারদিকেই খাড়া পাহাড় যা সাধারণভাবে ডিঙ্গানো যায়না। তাতে মাঝে মধ্যে বসার মতো খোদল। খাড়া পাড় অসম্ভব বড় ইন্দারার মতো সোজা নিচে নেমে গেছে। কিন্তু একদম সমতল না বরং তিন থাকে ভাগ হয়ে। আনুমানিক প্রায় দুইশত ফিট নিচে পরিস্কার ও স্বচ্ছ পানি। কিন্তু ওখানে নামার বা যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। পাড়ের চার ধার দিয়ে লোহার রেলিং দেওয়া যেন কেউ নিচে পড়ে না যায়। মাঝে মধ্যেই দেওয়ালের মধ্যে গুহার মতো অনেক থাক বা আলনা আছে। চওড়া অন্তত একশত/একশত পঁচিশ গজ হবে বলে মনে হয়। প্রচুর দর্শক প্রত্যেক দিন আল্লাহর এই অপূর্ব সৃষ্টি দেখতে এখানে ভির করে। অদ্ভুৎ ব্যাপার যে, এখানে আশে পাশে অন্য কোন পাহাড় নাই। কুয়ার মাঝামাঝি বেশ কিছু জংলী কবুতর বাকবাকুম করে সারাদিন।

এই কুপের অপর দিকে প্রায় চল্লিশ/পঞ্চাশ গজ পশ্চিমই একটা উষ্ণ প্রস্রবন। এটিও একটি পাহাড়ী কুয়া এবং প্রাকৃতিক এই বিশাল কুয়াকে ঘিরে পর্যটকদের জন্য একটি হোটেল কোম্পানী সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। প্রস্রবনের মধ্যের পানি প্রচন্ড গরম জন্য ওখান থেকে পাইপে করে গরম পানি এনে একটা সুইমিং পুলের ভেতরে দেওয়া হয়েছে। ফলে হালকা গরম মিশ্রিত এই পানিতে নেমে প্রত্যেক দিন অসংখ্য দর্শক প্রাকৃতিক চিকিৎসা হিসাবে গোসল করে। প্রত্যেকবার গোসলের জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ ইয়েমেনি রিয়েল নেয়। এমনিতে পানিতে নেমে হাত মুখ ধুতে কোন অর্থ দিতে হয় না বা কোন অসুবিধা নাই। লোকের বিশ্বাস যে এই পানিতে কয়েকদিন নিয়মিত গোসল করলে চর্মরোগ সেরে যায়। কথাটি কতটা বিজ্ঞান সমর্থিত তা বলা মুশকিল। তবে প্রাকৃতিক পানি তার চলার পথে গন্ধক, ফসফরাসসহ অনেক খনিজ পদার্থের সংস্পর্শে আসে এবং গন্ধকের চর্মরোগ নিরাময় সংক্রান্ত বিষয়টি সত্য হিসাবে অনেক প্রাচীন। প্রায় চারশত বছরের এই উষ্ণ প্রস্রবন ও প্রাকৃতিক কুয়াকে ঘিরে বেশ বড় একটা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং হোটেল ব্যবসা এখানে জমজমাট। দেশ বিদেশের প্রচুর দর্শক প্রত্যেকদিন এখানের হোটেল ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করে তুলছে। চমৎকার পাহাড় ও প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যাবলী এবং সুন্দর করে বানানো পিচ ঢালা রাস্তা কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। দামত এর গুরুত্ব দিন দিনই বাড়ছে বলে সাথীরা জানালেন।

একটা কূপ খনন করেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পানি লবনাক্ত। হুজুর (স.) আমাকে একটি পানি ভর্তি লোটা দিয়ে বললেন, এই পানি কূপে ঢেলে দাও। আমি ঢেলে দিলাম। ফলে, কূপের পানি মিঠা হয়ে গেল। বর্তমানে ইয়েমেনে এই কূপের পানি সর্বাধিক মিঠা।" আমরা কোথায়ও এই কূপ সম্পর্কে কোন খোঁজ জানতে পারিনি। ফলে ঐ কূপটি দেখা ও তার পানি পান করার আশা মনের মাঝেই থেকে গেল। আসলে আমাদের ঈমান ও আমল এতই দুর্বল ও নড়বড়ে যে, আমরা আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর খাজানা থেকে পাওয়ার আশাও করতে পারিনা। অথচ সাহাবীরা তা প্রয়োজন মতো পেতেন। ছাবেত, আবু এমরান জওফী ও হেশাম ইবনে হাসসান থেকে বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন: উম্মে আয়মন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর কাছে পাথেয় ছিলনা। রাওহা পৌছার পর তীব্র পিপাসা অনুভব করেন। উম্মে আয়মন বর্ণনা করেন: আমি শোঁ শোঁ বায়ু চলার শব্দ শুনলাম। মাথা তুলে চেয়ে দেখি সাদা রশীতে একটি বালতি বাঁধা আছে এবং আকাশ থেকে ঝুলছে। আমি বালতিটা নিয়ে নিলাম এবং পানি পান করলাম। এরপর থেকে আমি ভীষণ গরমের দিন রোজা রাখি এবং রৌদ্রে ঘুরাফিরা করি, কিন্তু মোটেই পিপাসা অনুভব করিনা।

কন্টেনারে ঠান্ডা পানি সবসময় থাকেই। একসাথী ভাই এসেই জানালার উপর থেকে গ্লাস নিয়ে পানি ঢেলে দাঁড়িয়েই খেতে শুরু করলেন। আসলে ইয়েমেনের যে সব অঞ্চলে আমাদের রোখ পড়েছে তার প্রায় সকল স্থানেই স্থানীয় জনগণের মধ্যে সুন্নতের অনুসরণ করার প্রবণতা বেশ কম বলেই মনে হয়েছে। তাই সাথী ভাইয়ের পানি পান শেষে এ বিষয়ে তাকে পানি খাওয়ার পাঁচটি সুন্নত সম্পর্কে অবহিত করা হল। হঠাৎ করেই একজন প্রশ্ন করলেন, পানি তিন শ্বাসে খাওয়া সুন্নত কেন? বলা হল আল্লাহর রসুল যেভাবে যা করেছেন সেটাই আল্লাহর বিধান এবং সেভাবেই তা মেনে চলতে হবে। হাদিস শরীফে দওস গোত্রের এক মহিলার তিন শ্বাসে পানি পান করার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ হয়েছে।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, দওস গোত্রের মহিলা উম্মে শুরায়কের স্বামী আবুল আকর মুসলমান হয়ে হযরত আবূ হুরায়রার (রা.) সঙ্গে হিজরত করেন। উম্মে শুরায়ক বলেন, এরপর আবুল আকরের আত্মীয়রা আমার কাছে এসে বলল, সম্ভবতঃ তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি। তারা বলল, আমরা তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব। অতঃপর তারা আমাকে একটি ধীরগতি, কষ্টদায়ক ও দুষ্টমতি উটে সওয়ার করিয়ে দিল। তারা আমাকে মধু দিয়ে রুটি খাওয়াত এবং এক ফোঁটা পানিও দিত না। দ্বিপ্রহরে যখন উত্তাপ খুব বেড়ে গেল, তখন তারা উট থেকে নেমে গেল এবং কম্বল দিয়ে তাঁবু খাড়া করে নিল। কিন্তু আমাকে প্রখর রৌদ্রের

বীর-এ-লাহিস এর পর মার্কাজ থেকে এবারে একসঙ্গে সাতটা মসজিদে আমাদের রোখ দিয়ে রেদায়-এ আমাদের অবস্থানের মেয়াদ পুরা করে দেওয়া হল। মসজিদ গুলো হলো আল খাবা, আল খায়ের, আল হিদায়াহ, আল আনছার, আল জাওয়ালী, আল মুসাল্লাহ ও আল হারিয়া। এসব মসজিদে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ঘটনা ঘটল না। তবে মসজিদে আনসারে এসে হঠাৎ করে একটা পরিবর্তন হল। মসজিদ কর্ণল আসাদের সাথীরা তাদের মসজিদে নেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছিলেন। বৃহস্পতিবারে এসে তারা এত অনুরোধ করছিলেন যে, সানার অবস্থানের মেয়াদ দুই দিন কমিয়ে কর্ণল আসাদ মসজিদে আগে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সাথীরা খুশি হয়ে শুক্রবার সকালে এসে তাদের মসজিদে নিয়ে গেলেন। বড় জুমা মসজিদ। প্রায় সব কিছুই আর সব মসজিদের মতো একই রকম। শুধু দুইটা জিনিষ নূতন। অজু খানায় ঢোকা ও বের হওয়ার সময় বড় অগভীর চৌবাচ্চায় পা না ডুবিয়ে কোন উপায় নাই। সংলগ্ন বিরাট বড় গোরস্তান যার এক দিকে কিছুটা স্থান প্রাচীর দিয়ে পৃথক করে রাখা। ভেতরে কিছু পাকা কবর। মনে হল যারা মসজিদের জন্য জমি দিয়েছেন তারাই এ অংশটি তাদের পারিবারিক গোরস্তান হিসাবে পৃথক করে রেখেছেন।

বিকালের গাস্তের আগে ছোট্ট একটা জিয়ারা। প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে দুই পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে সেই পানি জমিতে সেচের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। পাহাড়ী মানুষের কাছে এটা বিরাট কিছু। দুই ধারে পাথর গেঁথে তার মধ্যে মাটি ফেলে ভরাট করে তার উপরে আবার বড় বড় পাথর চাপা দিয়ে বাঁধ তৈরি করে পানি আটকানো হয়েছে এবং নিচে দুইটা বড় সেচের পাইপ বসিয়ে মেশিন দিয়ে পানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁধের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ/ষাট মিটার এবং পানির সঞ্চয় এখন প্রায় তলানীতে ঠেকে আছে। ফলে পানির মধ্যে বেশ কিছু আগাছা (শেওলা) জন্মেছে। কিছু ডুবুককুরী ধরনের ছোট ছোট জলজ পাখী পানির ভেতরের পোকা ডুব দিয়ে ধরে খাচ্ছে। স্থানীয় সাথীরা খুব গর্ব বোধ করছিলেন। আমি শুধু মনে মনে হাসছিলাম। কর্ণল আসাদ এর এই পানির রিজার্ভ দেখে যারা গর্ব বোধ করছে তারা যদি কোন ভাবে আমাদের কাপ্তাই লেক দেখতে পারত! পাহাড়ের অফুরন্ত পানিকে কি অসীম জলাধারে রূপান্তর করে তার সাহায্যে বিশাল বিদ্যুতের ভান্ডার, মৎস্য চাষের সুযোগ এবং চাষের জন্য জমিতে পানি ব্যবহারের যে বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে তা দেখে তাদের কি চোখের পলক ফেলার কথা মনে থাকত?

ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য কুয়া আছে যার পানি স্থানীয় সকল বাসিন্দা ব্যবহার করে। কিন্তু ইয়েমেনের একটি বিশেষ কুয়ার কথা হাদিস শরীফে আছে যার পানি সবচেয়ে মিষ্টি ও বরকতময়। হুমাম ইবনে নুফায়েল সাদী বর্ণনা করেন, "আমি রসুলল্লাহ (স.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, আমরা

মধ্যেই ছেড়ে দিল। রৌদ্রতাপে আমার বোধশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বিকল হয়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত তারা আমাকে এমনিভাবে রাখল। তৃতীয় দিন আমাকে বলল, তুমি যে ধর্ম গ্রহণ করেছ, সেটি ছেড়ে দাও। আমি তাদের কথা কিছুই বুঝলাম না। কারণ আমার ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে গিয়েছিল। আমি আকাশের দিকে আঙ্গুলি তুলে তাওহীদের ইশারা করতে লাগলাম। আমি যুগপৎ এই আযাব সয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের উপর পানিসহ বালতির শীতলতা অনুভব করলাম। আমি বালতি ধরলাম এবং তা থেকে এক শ্বাসে পানি পান করলাম। এরপর বালতিটি আমার কাছ থেকে নিজেই সরে গেল। আমি দেখলাম সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ঝুলন্ত রয়েছে এবং আমার নাগালের বাইরে রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়বার আমার কাছে বালতি আনা হল। আমি এক শ্বাসে পানি পান করতেই বালতি তুলে নেওয়া হল। আমি বালতির দিকে দেখছিলাম। বালতিটি আবার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল। অতঃপর তৃতীয়বার বালতিটি আমার দিকে আনা হল। এবার আমি বালতি থেকে মন ভরে পানি পান করলাম এবং মাথায়, মুখমন্ডলে এবং কাপড়েও পানি ঢেলে নিলাম। লোকেরা যখন তাদের তাঁবু থেকে বাইরে এল, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে পানি কোত্থেকে এল? আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। এ অবস্থা দেখে তারা বলে উঠল- আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তোমার রবই আমাদের রব। এখানে তুমি যা কিছু পেয়েছ, তোমার রবের কাছ থেকেই পেয়েছ। এরপর তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেল এবং রাসূল্লাহর (স.) দিকে হিজরত করল। আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করত।

আল্লাহর তরফ থেকে যে বেহেস্তি পানি পান করানো হল সেটাও তিন শ্বাসে পান করানোর স্পষ্ট উল্লেখ এখানে দেখা যাচ্ছে। আমরা নিজেদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক বলে ভাবতে ভালবাসি এবং সব কিছুতেই বিজ্ঞানের আপাত-আবিষ্কারকেই সত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে মনে করি। সে হিসেবেও এ কথা সত্য যে, প্রথমে পিপাসার কারণে গলা শুকিয়ে থাকে জন্য হাঠৎ করে প্রচুর পানি পান করা বিপদজনক এবং অবৈজ্ঞানিক। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্বাসে অল্প অল্প করে পানি পান করে কণ্ঠনালিকে ভিজিয়ে স্বাভাবিক করার পরে তৃতীয়বারে কাঙ্খিত পরিমাণ পানি পান করাই বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত এবং যুক্তিযুক্ত। আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামে এমন কোন বিধানই খুঁজে পাওয়া যাবে না যা মানুষের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য নির্দ্ধারিত নয়। লাখো কোটি শুকরিয়া তাঁর পাক দরবারে যে, তিনি তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবাণীতে আমার মতো নাচিজ বান্দাকেও ইসলামের মতো দৌলত দিয়ে তাঁর একত্বের ঘোষণাকারীদের মধ্যে শামিল করেছেন এবং মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (স.) উম্মতের দলভূক্ত করেছেন। আমিন।

আমাদের জামাতের সর্বশেষ মসজিদ ছিল মসজিদ হারিয়া। এখানেও দুই দিন থাকলাম। রেদায় আমাদের অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। এবার এল বিদায়ের পালা। আগামীকাল ভোরে এখান থেকে সানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা। আশে পাশের অনেক মসজিদের সাথী বিদায়ী সাক্ষাৎ এর উদ্দেশ্যে এলেন এবং অনেক রাতে বাড়ী ফিরে গেলেন।

অনুরোধ ছিল আর মাত্র একদিন থাকার জন্য। কিন্তু মাশোয়ারায় অনুরোধটি রাখা সম্ভব হলনা। বরং ভোরেই রওয়ানা হতে সবাই একমত হওয়ায় উনাদের সেটাই জানিয়ে দেওয়া হল। ফজরের নামাযের জামাত-এ ঘর ভরে গেল। আশে পাশের বিভিন্ন মসজিদের সাথীরা আমাদের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য ফজরের জামাতেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের জন্য তাদের এই আন্তরিক ভালবাসার মধ্যে এতটুকুও খাদ বা ভেজাল নাই। একজন প্রকৃত মোমিন তার ভাই এর জন্য যা করে তা মন-প্রাণের দরদ ঢেলে দিয়েই করে। লোক দেখানো বা ছলনা দিয়ে মন ভোলানোর মানষিকতা থাকে সেখানে অনুপস্থিত। তাই আমাদের মাল সামানা গাড়ীতে উঠনোর পরে এবং আমাদের গাড়ীতে উঠার পূর্ব মুহূর্তে বুকে বুক মিলিয়ে অঝোর কান্নার যে ঝর্ণাধারা উভয় পক্ষের গাল বেয়ে দাড়িতে এসে ঠাঁই নিল তার মধ্যে কৃত্তিমতার কোন ছোঁয়া ছিল না, ছিল না কোন অভিনয়। মুখে কথা ছিল খুব কম অথচ বুকে বুকে কথার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যেই মনে পড়ে গেল,

"ক্ষমা কর, ধৈর্য ধর, হোক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ,
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়, শুধু সমাপন।"

আমরা যারা নিজের মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারি না কবি সাহিত্যিকরা তো তাদের মনের কথাই তাদের লেখনিতে সাজিয়ে রাখেন আমাদের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর সুবিধার্থে। আসলেই তো। চার মাস আগে সারা আলমের মুসলমান ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের ফিকিরের যে কর্মশালা শুরু হয়েছিল তার আজকে সমাপ্তি– সফল সমাপ্তি কি না তা বলতে না পারলেও সু-সমাপ্তি যে হল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। অবশেষে আবেগ এক সময় প্রয়োজনের কাছে হার মানল। গাড়ীর চাকা ধীরে ধীরে সামনের দিকে সানা অভিমুখে চলতে শুরু করল।

শেষের কথা

নয় তারিখ সকাল প্রায় দশটার পরপরই সানা মার্কাজে এসে পৌঁছালাম। এবার আর কোন রোখ নয়। এবার শুধু বিশ্রাম আর দেশে ফেরার সময়কে কাছে নিয়ে আসা। তবে আমাদের মনের মাঝে যে স্বপ্নগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে স্বপ্ন দেখত সুযোগ ও সুবিধা বুঝে তারা এবার মুখ বের করে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। যেমন পুরাতন সানার সূর্য উপাসক সম্রাজ্ঞী বিলকিসের সিংহাসন এর স্থানটি যা আরশে বিলকিস নামে খ্যাত তা এই সুযোগে দেখে নেয়া। এছাড়া আছে আসহাবে জান্নাহ এবং আবরাহার তৈরি করা উপাসনালয় যা সে কাবার বিকল্প হিসাবে তৈরি করে ক্ষমতার দাপট দিয়ে কাবার মতো সম্মানীয় ও অতীব মহিমান্বিত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি যে ইচ্ছাটা সকলের হৃদয়ের গভীর তন্ত্রীতে পুরা সফরেই অনুরণন তুলেছে তা ছিল "ওমরা" করা। ঐ নিয়ত পূরণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় কয়েকদিন সময় হাতে নিয়েই যে আমরা সানায় এসেছিলাম তা বোধ হয় না বললেই চলে। এ কারণেই আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে ওমরা করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় প্রত্যেকেই দেশে থেকেই নিজের বেডিং এর মধ্যে ইহ্‌রামের কাপড় নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের জামাতের ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জনের আগে থেকেই নিজের ইহরামের কাপড় বাড়ীতে ছিলই, তাই নতুন করে কেনারও প্রয়োজন হয়নি। প্রতিটি এলাকায়ই আমরা ওমরা সম্পর্কে সুযোগ পেলেই খোঁজ খবর নিয়েছি- অনেককে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য অনুরোধও করেছি। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা আমাদের এই ইচ্ছার পক্ষে ছিল না। ওমরা বা হজ্বের ক্ষেত্রে ইয়েমেনিদের জন্য নিয়ম হল মাথা পিছু ৩,০০০/- (তিন হাজার) ইয়েমেনি রিয়েল দিলেই পনর দিনের জন্য সীমান্ত থেকেই বৈধভাবে অস্থায়ী ভিসা পাওয়া যায়। মাত্র পঞ্চাশ/ষাট মাইল গেলেই সৌদি আরব সীমান্ত এবং প্রত্যেক দিন প্রচুর ট্রাক ইত্যাদি বিভিন্ন মাল নিয়ে সে দেশে যায়। এ ছাড়া যারা চাকুরীজীবি তারা তো বৈধ ও অবৈধ উভয় পথেই যাতায়াত করে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আইন সম্মত অস্থায়ী ভিসা নিয়ে মক্কা যাওয়ার। মক্কা এখান থেকে মাত্র এক হাজার কিলোমিটার। কিন্তু কেউ এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত প্যাকেজ ট্যুর যারা আয়োজন করেন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হল। কিন্তু সুবিধা হল না। তারা মাথাপিছু তিন লক্ষ ইয়েমেনি রিয়েল সাকূল্য খরচ বাবদ চাইল যা আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিলনা। তাই সানায় দুতাবাসের মাধ্যমে শেষ চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেখানেও কোন সুফল হল না। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে কেউ অন্ততঃ এক বৎসর ইয়েমেনে থাকলে তবেই বৈধভাবে অস্থায়ী ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে যাওয়ার

সুযোগ পেতে পারে। বাধ্য হয়ে এ পথও ছাড়তে হল। অবশেষে দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তারা বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করে বৈধভাবেই আমাদের নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু ওমরার জন্য আমরা যে টাকা জমা রেখেছিলাম তার দ্বিগুনের কিছু বেশি মাথাপিছু দাবী করল। হাতে সময় কম তাই মোবাইলে হাজী মুনির ভাইয়ের মেয়ে জামাই এর সঙ্গে রিয়াদে যোগাযোগ করে এই শর্তে টাকার ব্যবস্থা করা হল যে, আমরা পাবনা এসে বাংলাদেশী টাকায় ধারের টাকা মুনির ভাইকে ফেরৎ দেব এবং তিনি জামাই এর জন্য যে বাড়ী বানাচ্ছেন তাতে সে টাকা খরচ করবেন। আমরা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু এবার আল্লাহর ফয়সালা ছিল অন্য রকম। আমাদের এক সাথী এ ব্যবস্থায় যেতে অস্বীকার করে বললেন যে, এর চেয়ে কম টাকায় বাংলাদেশ থেকেই তিনি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন। অথবা বিকল্প হিসাবে তাকে সানায় রেখে আমরা যদি যেতে চাই তাতেও তিনি রাজী আছেন।

বাড়া ভাতে ছাই পড়ার পর চেহারা যেমন হয় আমাদের অবস্থা এখন সে রকম। শেষ পর্যন্ত আমাদের দোয়া, নামায, রোযা সবই জমা থেকে গেল। আসমানী ফয়সালা মনে করে অনেক আলোচনার পর ঠিক করা হল যে, পুরা জামাত ছাড়া ওমরাতে যাওয়া উচিৎ হবে না। বিকল্প না থাকায় পুরাতন সানার ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখে মনকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়া যাবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর মতো আরকি। তখনই মার্কাজে ভাই লাবিব এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমীর সাহেব মাশোয়ারা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

পরের দিন ১০ই মে। নাস্তার পর হাতে পানির বোতল নিয়ে নিচে নেমে গাড়ী ঠিক করা হল। প্রথমে যাওয়া হবে জাতীয়ভাবে নির্মিত সালেহ জামে মসজিদে। এবং যোহরের নামায ঐ মসজিদে পড়া হবে। বিরাট এলাকা জুরে অনেকটা মদীনা মনোয়ারার আদলে এই মসজিদ কমপ্লেক্সটি তৈরি হয়েছে। মসজিদ কমপ্লেক্সের চার দিকেই রাস্তা এবং কমপ্লেক্সও রাস্তার অপর পাড়ে নয়নাভিরাম ফুল বাগান তৈরি করা হয়েছে যা চোখকে চুম্বুকের মতো টেনে রাখে। প্রশস্ত গাড়ী পার্কিংসহ নানা আয়োজন প্রায় তিনতালা সমান উঁচু ছাদ, ফলে ঘরের ভেতরে চমৎকার শীতল স্নিগ্ধতা, কেমন যেন একটা পবিত্র আবহাওয়ার জন্ম দিয়েছে। বেশ পুরু কার্পেট পুরা ঘর জুরে। বিশেষ ডিজাইনে তৈরি করা। নব্বইটা কাতার এবং প্রত্যেক কাতারে দুইশত/দুইশত পঞ্চাশ জন মুসল্লি বসতে পারবেন। প্রথম কাতারের সামনে প্রায় সমসংখ্যক কোরআন শরীফ রেহেলের উপর রাখা। চমৎকার সুগন্ধি বাতাস পিলার গুলোর নিচের দিক দিয়ে বের হয়ে আসছে। প্রতি শুক্রবার প্রেসিডেন্ট নিজে জুমার নামাযে অংশ নেন এবং এছাড়াও যখনই সময় ও সুযোগ পান ওয়াক্তিয়া নামাযে যোগ দেন। বাইরে নিরাপত্তা রক্ষীরা বলল, মসজিদের ভেতরে পঁচিশ হাজার এবং বাইরে দশহাজারসহ

সর্বমোট পঁয়ত্রিশ হাজার মুসল্লি একত্রে নামায আদায় করতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক অজু, এস্তেঞ্জার ব্যবস্থা ছাড়াও পায়ের চপ্পল ইত্যাদি রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কার্ড সিষ্টেম এবং কার্ড ছাড়াও রাখা যায় এবং এ জন্য কোন ক্ষেত্রেই পয়সা দিতে হয় না। আমরা ওখানে কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত ও তাসবিহাত শেষে যোহরের নামাজ আদায় করে গাড়ীতে এসে উঠে বসলাম।

আজ ১১ই মে আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল বাদশাহ আবরাহার তৈরি নকল কাবা ঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া। পথে যেহেতু ইয়েমেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও বুজুর্গ মওলানা আব্দুল আলা জিন্দানীর মাদ্রাসা জামেয়া ঈমানিয়া পড়বে সে জন্য প্রথমে ওখানে যেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফায়েজ ও বরকত নেওয়ার আশা ছিল। মওলানা গুরুতর অসুস্থ্য জন্য গত তিন/চার দিন তাঁকে কারো সঙ্গেই দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং কথার্বাতা বলা একদম নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা। ফলে অবরুদ্ধ আশা বাইরের সুন্দর সোনাঝড়া সবুজ পৃথিবীর আলো দেখা থেকে এখানেও বঞ্চিত হল। ফারসী কবি এ জন্যই বোধহয় বলেছেন :

"আজব দরদেস্তে আন্দার দিল আগর গুইয়ম জঁবা সুজাদ
আগার দরদিল নেহাঁ দারম দেমাগ ও উস্তো খাঁ সুজাদ"।

কথাটাকে বাংলায় এভাবে বললে কেমন হয়?

বুকের মাঝের গোপন ব্যাথা জ্বালায় এ মন সর্বক্ষণে
সেই আগুনে পুড়ায় জিহ্বা, হাড়, মজ্জা, মাংস ও মনে।

পরে পাণ্ডুলিপি দেখে মওলানা মাসউদ এটাকে এভাবে সংশোধন করে দিলেন,

বুকের মাঝে দারুন ব্যথা, বলতে গেলে জিহ্বা পোড়ে
আর লুকিয়ে রাখতে গেলে হাড়, মজ্জা মগজ পোড়ে।

আল্লাহ দুনিয়াকে মুমিনের জন্য বানিয়েছেন কারাগার আর কাফেরদের জন্য একে করা হয়েছে বেহেশত। তাই মুমিন আখেরাতের চিরস্থায়ী মঙ্গলের আশায় দুনিয়াতে অল্প সময় কষ্ট করতে দ্বিধা বোধ করেনা। কিন্তু কাফেরদের তো আখেরাতে কোন পাওনা নাই শুধুমাত্র আজাব ছাড়া তাই তারা দুনিয়াতেই সর্বসুখ প্রত্যাশা করে। তাদের সম্মুখে একটা সোনার উপত্যকা দিলেও তারা আরো একটা সোনার উপত্যকা পেতে আকাঙ্খা করে। বেচারা আবরাহার ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই ঘটনা।

প্রায় অজ্ঞাত কুলশীল আবরাহা খৃষ্টীর ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাগে দক্ষিণ আরবের একজন খৃষ্টান শাসক ছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে তার প্রসিদ্ধির কারণ,

তিনি একটি ইয়েমেনি বাহিনীর মাধ্যমে মক্কা আক্রমণ করে পবিত্র কাবা ঘর ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। হুজুর (স.) এর জন্মের বৎসর অর্থাৎ পাঁচশত সত্তর খৃষ্টাব্দে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল এবং হুজুর (স.) তার জীবন কালে সেই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেককে জীবিত অবস্থায় পেয়েছেন। বাইজেনটাইন সম্রাট জাষ্টিনিয়ন (৫২৭- ৫৬৫) দক্ষিণ আরব আক্রমণ ও জয় করে বিজিত এলাকার জন্য ইসিমিফাইওম কে শাসনের ভার দিয়ে দেশে ফিরে যান। এই শাসকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরাজিত দক্ষিণ আরবের সৈন্যরা পুনরায় সংগঠিত হয় এবং ইসিমিফাইওমকে পরাজিত করে আবরাহাকে সিংহাসনে বসায়। আবরাহা ছিল আন্দুলিস বন্দরের এক খৃষ্টান বণিকের ক্রীতদাস। কিন্তু নিজ যোগ্যতায় ও ভাগ্যের আনুকূল্যে শেষ পর্যন্ত বাইজেটাইন সম্রাট জাষ্টিনিয়ার অধীনে দক্ষিণ আরবের শাসনকর্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তার অন্যতম কীর্ত্তি "মা আরিফ" এর বাঁধের দেওয়াল পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার। পরে সেখানে তার একটি দীর্ঘ শীলালিপি স্থাপন করে যার মধ্যে একটি যুদ্ধ জয়েরও বিবরণ পাওয়া যায়। সূত্রমতে পরবর্তীকালে বাইজেনটাইন সম্রাট বনুওয়াসের মৃত্যুর পর নূতন সম্রাট আল আসবাহা আবরাহাকে ইয়েমেনের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

ইসলাম পূর্ব যুগেও কাবা শরীফ ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমানভাবে মহাপবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচিত হত। এই কাবা শরীফকে তওয়াফের মাধ্যমেই হজ্জ পালন করা হত এবং একমাত্র এই কারণেই মরুভূমির দেশ মক্কা সারা পৃথিবীতে খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ শহর হিসাবে গণ্য হত। হজ্জের সময়ের আয়ে মক্কাবাসীদের জীবনযাত্রা চলত এবং তারাও এ কারণেই খুব সম্মানিত ছিলেন। আবরাহা এটা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি এই সম্মান, মর্যাদা ও অর্থ হাতে পেতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ইয়েমেনের একটি শহর "সানা"তে (বর্তমান ইয়েমেনের রাজধানী) একটি গীর্জা তৈরি করে সারা রাজ্যে নির্দেশ জারী করে দেন যে, এখন থেকে কাবা শরীফের পরিবর্তে সানার গীর্জা তওয়াফ করে হজ্জ পালন করতে হবে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে মনের ভালবাসা ও আবেগকে সব মানুষ বেশি গুরুত্ব দেয় জন্য আবরাহার এই লোলুপ জিহ্বার আহ্বান কোন মানুষের কাছে গুরুত্ব পেল না। ক্ষোভে দুঃখে বাদশাহ আবরাহা এ জন্য কাবাকে দায়ী মনে করে কাবা ঘরকেই ধ্বংস করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কিভাবে কাজটা করা যায়? শয়তান তাকে বুদ্ধি যোগাল যে, এসব ভাঙ্গার কাজে হাতি ব্যবহার করলে কাজ সহজ হবে। সুতরাং আবিসিনিয়ার শাসন কর্তার নিকট অনুরোধ করে তিনি হস্তিবাহিনী নিয়ে আসলেন এবং সসৈন্যে মক্কা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেন। পাঁচশত সত্তর খৃষ্টাব্দের এই সম্মিলিত বাহিনী মক্কা ও তার আশে পাশের এলাকা দখল করে কাবাঘরের নিকট উপস্থিত হল। তখন কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল হুজুর পাক (স.) এর দাদা

আব্দুল মুত্তালিবের উপর। তিনি কাবা ঘরের চাবি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘরের ভেতরে রেখে দিয়ে এবং আল্লাহর ঘর আল্লাহই রক্ষা করবেন বলে মক্কা থেকে দূরে সরে যান। আল্লাহ তার নিজের কুদরতে তখন ঐ ঘর রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁক পাঠান যাদের দুই পায়ে দুইটা ও ঠোটে একটা করে ছোট ছোট কঙ্কর দানা ছিল। ঐ সব কঙ্কর দানা যখন উপর থেকে নিচে হস্তি বাহিনীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তা সরাসরি হাতির শরীর ভেদ করে মাটিতে পৌছে এবং সমস্ত হস্তিবাহিনী চর্বিত তৃণ খন্ডের মতো নিষ্পেষিত ও ধ্বংস হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে সুরা ফিল নাজিল করে আল্লাহপাক অনাগত মানুষকে তার কুদরতের নিদর্শন জানিয়ে দেন। সুতরাং সেই ধ্বংসাবশেষ দেখার আগ্রহ সবার মধ্যেই ছিল।

সানার সবচেয়ে বড় বাজার বাবে ইয়েমেনের খুব নিকটেই আবরাহার এই গীর্জার ধ্বংসস্তুপের অবস্থান। চারিদিকে বাড়ী-ঘর এমনভাবে জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে যে, প্রাচীর ও গ্রীল দিয়ে ঘেরা কুয়ার মতো প্রায় বিশ/ত্রিশ হাত গভীর ঐ গর্তটাকে সাধারণ একটা মজে যাওয়া বা ভরাট হয়ে যাওয়া পাথর দিয়ে বাঁধানো ইন্দারা বলে মনে হবে। নিচে ভরাট মাটির উপরটা কিছু ঘাস ও আগাছা ঢেকে ফেলেছে। ধারে দুইটা ডুমুর ও কিছু ফিলফিল গাছ পাঁচ/সাত হাত করে লম্বা হয়ে এক রকম ঝোপের মতো চেহারা নিয়েছে। দেওয়ালের গায়ে কোন কিছু লেখা নাই। ফলে কেউ বলে না দিলে এটা কি সে সর্ম্পকে কিছু বোঝা যাবেনা। এর সামান্য উত্তর-পূর্বে হুজুর (স.) এর নির্দেশে যে মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল সেই ছোট্ট মসজিদটির অবস্থান। চারদিকেই সম্প্রসারণ করে এখন তা একটা বিরাট মসজিদ ও মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। মধ্যে একটা চতুস্কোন ঘরের মতো যার দরজা জালানা নাই অথচ সুন্দর ভাবে নক্সা করা। আশে পাশের কেউ সঠিকভাবে কিছু জানাতে পারলনা এবং একেক জন বিভিন্ন রকম কথা বলল। প্রাচীন মসজিদটি সংস্কার করা হচ্ছে তাই তার দরজাগুলো বন্ধ করে ভেতরে কাজ হচ্ছে। কাঠের তীর ও বর্গা দিয়ে তৈরি ছাদ এখনও ঠিক আছে। তবে তীর ও বর্গাগুলো সুন্দর করে নক্সা ও রং করা। দেখে মনে হল, কোন এক সময় আগের ছাদ নষ্ট হয়ে গেলে নতুন করে এই নক্সাদার কাঠের ছাদ তৈরি করা হয়েছিল। নতুবা সে যুগের ছাদ ও কাঠ এত ভাল থাকার কথা নয়। দেওয়াল গুলো আড়াই হাতের মতো চওড়া। তার উপরের প্লাষ্টারিং চটানো হচ্ছে নতুন করে প্লাষ্টরিং ও রং করার উদ্দেশ্যে। যোহরের সময় হতে তখনও অনেক দেরী ছিল জন্য সবাই দুখূলুল মসজিদ ও কিছু নফল নামায আদায় করে পরবর্তী গন্তব্যের জন্য আমরা গাড়ীতে উঠলাম।

দূরত্ব এত কম যে গাড়ীতে না উঠলেও আরামে বাজার পর্যন্ত হেঁটেই আসা যেত। বাবে ইয়েমেন এক বিশাল বড় মার্কেট। এখানে দেশী বিদেশী সব ধরনের

জিনিষই প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। হাতে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট অর্থ-ফেরৎ নিয়ে যাওয়ায় বদলে বাড়ীতে অবস্থিত পরিজনদের জন্য হালকা কিছু উপহার আজকে এখান থেকে কেনা হবে বলে স্থির হয়েছে। আগামীকাল যেহেতু আরশে বিলকিস যাওয়ার কথা এবং সকালে গেলেও দূরত্বের কারণে এক দিনে যেয়ে ফিরে আসা যাবেনা তাই এই উদ্দ্যোগ। জামাতের সাথীরা দুই জন করে ভাগ হয়ে তিন দল তিন দিকে ছড়িয়ে পড়লাম। প্রচুর দোকান এবং ততোধিক প্রচুর ক্রেতা - পুরুষ মহিলা কোনটারই কমতি নাই। ছোট বাচ্চার সংখ্যা খুব কম। দরদাম করেই কিনতে হয় তবে বেশিক্ষণ দামাদামীর প্রয়োজন হয়না। আমরা দুজন জিনিষ তেমন কিনব না মূলতঃ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে বাজারের বিভিন্ন দিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ইয়েমেনে শিল্প ও কল-কারখানা খুব কম, প্রায় সব জিনিষই বিদেশী। এর মধ্যে চীনের পণ্য সামগ্রী মূলতঃ বেশির ভাগ স্থান জুরে আছে। ভারত ও পাকিস্তানের পণ্য সামগ্রী কিছু পাওয়া যায় তবে পুরা বাজার ঘুরেও বাংলাদেশী কোন পণ্যই খুঁজে পেলাম না। মনে খুব দুঃখ লাগল। অনেক পণ্যই দেখলাম যার মানও দাম উভয়ই বাংলাদেশের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে যথাক্রমে কম ও বেশি। কিন্তু প্রয়োজনীয় চেষ্টা ও উদ্দোগের অভাবে নিম্নমানের জিনিষ উচ্চদামে বিক্রী হচ্ছে। তবে ট্যাক্স ফ্রি পণ্যও প্রচুর এবং সেসব পণ্য আমাদের দেশের চেয়ে দামে অনেক সস্তা।

হঠাৎ করে একটা দোকানের দিকে চেয়ে চোখ থমকে গেল। ক্রেতাদের মধ্যে দুজন বোরখা ছাড়া মহিলা রঙ্গীন সালোয়ার কামিজ পড়া। ভাল করে দেখলাম যে ভুল দেখছি কিনা। কিন্তু না, ঠিকই দেখছি। কৌতুহল আমাদেরকে দোকানের কাছে টেনে নিয়ে গেল। কেনাকাটা শেষ করে মহিলা দুজন এদিকে মুখ ফেরাতেই কপালের সিন্দুর চোখে পড়ল। বুঝলাম এ জন্যই বোরখা ছাড়া মহিলা ইয়েমেনের মাটিতে আমাদের চোখে পড়ল। অনেককেই দেখলাম অবাক হয়ে আমাদের মতো ওদের দিকে তাকাচ্ছে এবং দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

আমাদের আগামী কালের জন্য গন্তব্য নির্ধারিত হলো কওমে সাবার ঐতিহাসিক রাণী বিলকিসের সিংহাসন রাখার স্থান আরশে বিলকিস। সানা থেকে পূর্ব দিকে পুরাতন সানায় স্থানটি অবস্থিত। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রথম যুগে কওমে সাবার অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করলে হুজুর (স.) হযরত ফারওয়া ইবনে মুসাইক গুতাইফী (রাঃ) কে তার নিজের কওম 'কওমে সাবার' বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন। সাবা শব্দটি খুব অপরিচিত ছিল বিধায় এক সাহাবী হুজুর (স.) কে প্রশ্ন করেন ইয়া রসুলুল্লাহ (স.) সাবা কি কোন ভুখন্ডের নাম নাকি কোন মেয়েলোকের নাম? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যে সাবা কোন ভুখন্ড বা মেয়েলোকের নাম নয় বরং আরবের এক পূর্বপুরুষের নাম। তার দশটি ছেলে ছিল যাদের মধ্যে ছয় জন ইয়েমেন ও চারজন শাম অর্থাৎ সিরিয়ায় বসতি

স্থাপন করেছিল। সিরিয়ায় বসতি স্থাপনকারীদের নাম ছিল লাখম, জুযাস, গাসসান ও আমেলাহ। আর ইয়েমেনে বসতি স্থাপনকারী ছয়জন যথাক্রমে আযদ, কিন্দাহ, হিময়ার,আশআরীগন, অনমার ও মাযাহিজ। উক্ত ব্যক্তি পুনরায় জানতে চাইলেন, অনমার কাহারা? হুজুর (স.) জানালেন যে, খাসআম ও বাজীলাহ গোত্রদ্বয়ই অনমারের বংশধর। যাহোক সেই ঐতিহাসিক সাবা গোত্রের রাণী বিলকিস যে স্থানে তার সিংহাসনে বসতেন সেটাকেই বলা হত আরশে বিলকিস। আমাদের আজকের গন্তব্য স্থির হল আরশে বিলকিসের সেই ঐতিহাসিক স্থানটি। সিংহাসন না থাকলেও স্থানটি এখনও আছে সেটাই বা কম কিসে?

আরশে বিলাকস এর সঙ্গে যে দুইটা নাম জড়িয়ে আছে তা হল, হযরত দাউদ (আ.) এর ছেলে হযরত সোলায়মান (আঃ) ও কওমে সাবার রানী বিলকিস। পৃথিবীখ্যাত যে তিনটা প্রশ্ন হযরত দাউদ (আঃ) তার ছেলেদের করেছিলেন তা ছিল এ রকমঃ (১) সবচেয়ে কাছের জিনিষ কোনটি (২) সবচেয়ে দূরের জিনিষ কোনটি এবং (৩) সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ কোনটি। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেন নি বালক সোলায়মান ছাড়া। তিনি বলেছিলেন, সবচেয়ে কাছের জিনিষ মৃত্যু তা যে কোন মূহুর্তে যে কোন স্থানে ঘটতে পারে। সবচেয়ে দূরের জিনিষ কবর যার অভ্যন্তরের কোন খবর কোনদিন জানা যাবে না। আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ আখেরাতের পাথেয় যা মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়ে অর্থাৎ রোজ কেয়ামতে বিচারের সময় দরকার হবে যে সময়ে অন্য কোন কিছু কোন কাজে আসবে না। দাউদ (আঃ) তখনই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এই ছেলে ইতিহাসের পৃষ্ঠা জুরে থাকবে। আসলেও তাই হয়েছিল। নবী হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন পৃথিবীর চারজন সবচেয়ে বড় রাজত্বের এবং ক্ষমতাধরদের একজন। এদের মধ্যে দুইজন ছিলেন কাফের। এর ছিলেন নমরূদ ও নেবু কাদনেযযার এবং আস্তিক দুই জন ছিলেন মহামতি জুলকারনাইন ও হযরত সোলায়মান (আঃ)। তাদের মধ্যে বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়নতা ছাড়াও আল্লাহ প্রদত্ব ঐশী শক্তির কারণে হযরত সোলায়মান (আঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। জিন, বাতাস ও জীব জগৎ তার আজ্ঞাবহ ছিল এবং জীব জন্তু ও পাখীদের ভাষাও তিনি বুঝতেন। এর সুবাদে সাবা রাজ্য ও তার রানী বিলকিসের খবর তিনি সর্বপ্রথম হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে এই সাবা সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল তদানিন্তন দক্ষিণ আরব, মিশর ও ইথিওপিয়া জুরে। ঐতিহাসিক তাবারীর ফারসী উদ্ধৃতি মোতাবেক তিনি ছিলেন আবু শিরহ নামক জনৈক চীনা ভূপতি ও এক পরীর কন্যা। পক্ষান্তরে যামাখশারীর মতে, তিনি ছিলেন শুরাহিলের পুত্র হিময়ারী তুব্বার পরিবারভূক্ত। অপূর্ব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি দক্ষিণ আরবের রাজ বংশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রানী বিলকিস মা'রিবের

প্রাসাদে বসবাস করতেন। *কোরআন শরীফের সাতাশ নং সুরার বাইশ-চল্লিশ* আয়াতে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সাবার পৌত্তলিক এই রানী সূর্যের উপাষক ছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন উপাষনা করার সময় হুদহুদ পাখি তাকে এ অবস্থায় দেখে এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) কে যেয়ে বিস্তারিত জানায়। তিনি হুদহুদের মাধ্যমেই সাবার রানীকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। রানী এ পত্র পেয়ে সোলায়মান (আঃ) সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে খুব ভয় পেয়ে যান এবং প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে সোলায়মান (আঃ) এর নিকট দুত পাঠান। কিন্তু এ উপঢৌকন সাদরে গৃহীত না হওয়ায় তিনি নিজেই দেখা করতে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তার আসার খবর যথাসময়ে জানতে পেরে হযরত সোলায়মান (আঃ) রানীর আগমনের পূর্বেই রাণীর সিংহাসন নিয়ে এসে কাঁচের তৈরি একটি ঘরে স্থাপনের জন্য জ্বিন সর্দ্দারকে বলেন। কিন্তু জ্বিন সর্দ্দার যে সময় লাগবে বলেন তার চেয়ে দ্রুত সিংহাসন আনতে কেউ পারবে কিনা জানতে চাইলে তার উজির আসাফ অতিদ্রুত সিংহানটি আনা ও কাঁচের ঘরে স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, রানী নিজের সিংহাসন চিনতে পারেন কিনা এবং তার পায়ের লোম সম্পর্কে যে কথা প্রচলিত ছিল তা পরীক্ষা করা। পরবর্তীতে রানী নিজে এবং তার সম্প্রদায় সাবারা ইসলাম গ্রহণ করে। খৃষ্টান আবিসিনিয়ায় সাবার রানীকে ম্যাকেদ্যা বলা হত এবং ঐ দেশের প্রচলিত উপাখ্যান মতে রানীর সঙ্গে হযরত সোলায়মান (আঃ) এর বিবাহ হয়েছিল। কোরআন মজিদে রানীর নাম উল্লেখ হয়নি তবে গ্রীকরা তাকে পাল্লাকিস, যোষেকাস এবং ইহুদিরা তাকে নাওয়াকালিস নামে অবিহিত করত। ধারণা করা হয় যে, পাল্লাকিস অথবা নাওয়াকালিস পরে বিলকিসে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৪ মে দুপুরে আমাদের ফিরতি যাত্রার প্লেনের টিকেট কনফার্ম করা হয়ে গেছে। মাঝে আজ ও কালকের এই দুইটা মাত্র দিন। যা দেখার তা এর মধ্যেই তাড়াহুড়ো করেই সারতে হবে। আজ বারই মে। সকালে রওয়ানা হওয়ার আগেই জানা গেল, যে দুইটা পাকিস্তানী জামাত হুদাইদার উদ্দেশ্যে গতকাল রওয়ানা হয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। বিদেশী মেহমানদের নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অঞ্চলসহ সন্দেহ জনক কোন এলাকায়ই কোনভাবেই তাদের যেতে দেওয়া হচ্ছেনা। কেউ কেউ আমাদেরকে সাবধান করে দিলেন যে, মা'রেফ সহ আরশে বিলকিস সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত জন্য আমাদেরও ওদিকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা না হওয়াই উচিৎ। এদিকে আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে "যা থাকে কপালে অন্তত মা'রেফ এর উদ্দেশ্যে আগে রওয়ানা হই তার পর যা হোক হবে" এ রকম মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত হল, আমাদের হাতে প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা হওয়া পর্যন্তই আছে আর সফলতা বা চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর হাতে। সুতরাং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আমরা গাড়ীতে

উঠে বসলাম। মাল সামানা ঘরে রেখে গেলাম। রাত্রে কোন এক মসজিদে থাকা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

তরতর করে বয়ে চলা নদীর মতো সাবলীলভাবে পিচঢালা রাজপথ দিয়ে আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলল। প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে পাসপোর্ট ও হুদাইদা মার্কাজের চিঠি ও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। মা'রেফ এখান থেকে প্রায় দুইশত কিলোমিটার। ওখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার আরশে বিলকিস যেতে হবে। সুতরাং গাড়ী বেশ বেগেই ছুটছিল। আমাদের চেহারা আর ইয়েমেনিদের চেহারার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নাই। আশা করছিলাম যে, যেহেতু স্থানীয় লোকদের যেতে কোন বাঁধা দিচ্ছে না সুতরাং হয়ত দ্রুত বেগে গাড়ি নিয়ে পার হয়ে যেতে পারব। কাগজপত্র সহ আমির সাহেব সামনের সিটে বসে আছেন। প্রয়োজনে তিনি কথাবার্তা চালাতে পারবেন। পেছনে আমরা বসে আল্লাহর সৃষ্ট অপূর্ব দৃশ্যাবলী দেখছি আর হাতে তসবিহ এর দানা ঘুরাচ্ছি। হঠাৎ সামনেই কিছু দূরে চেক পোষ্ট দেখা গেল। বেশ কিছু গাড়ী রাস্তার দুপাশেই দাঁড় করানো। আমাদের একটানেই বের হয়ে যাওয়ার যে আশা ছিল তা আর পূরণ হল না। একজন গার্ড আমাদের গাড়ী চেক করতে এসেই আমাদের দেখে তার উপরওয়ালা একজনকে ডেকে আনল। তিনি আমাদের ফিরে যেতে বললেন। আমরা তাকে অনেক করে অনুরোধ করেও মন গলাতে পারলাম না। ভদ্রলোক খুবই কৌশলী, আমরা যেন আর অনুরোধ করতে না পারি সে জন্য পোষ্ট ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও আমরা তাঁকে আর পেলাম না। অবশেষে আর কোন উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে মার্কাজের দিকে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল।

আজ তেরই মে, আমাদের হাতে কোনই কাজ নেই– কোথায়ও যাবার সূচী নেই। সকালে নাস্তার পর আবার নূতন করে মাশোয়ারায় বসা হল– উদ্দেশ্য আমাদের এই চার মাসের মূল্যায়ন করা। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, যতটা শ্রম ও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করা উচিত ছিল তা আমরা করতে পারিনি। তবু এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে সামনের এস্তেমায় অনেক বেশি সাথী ভাই ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন দেশে সফরে যাবে। তবে যেসব স্থানে আমাদের যাওয়া হয়নি বা হল না তার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সেসব এলাকা আমাদের এই সফরে আল্লাহ তায়ালা মঞ্জুর করেননি। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চাশ হাজার বছর আগের ফয়সালা মতো আমাদের রিযিক ওখানে ছিল না। ফারসী বয়াত মনে পড়ল :

দো চিজ আদমিরা কাশাদ যোর ই যোর
একে আব ও দানা দিগর খাক ই গোর।